• তিনটি ভিন্ন স্বাদের ধারাবাহিক

• গল্প • ভ্রমণ • বিশেষ রচনা


# সাপ্তাহিক বর্তমান

৭ ডিসেম্বর ২০২৪ • দাম ১০ টাকা


# ১০০ রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ

- সুগার • প্রেশার
- গ্যাস-অম্বল • ব্যথা-বেদনা
- শিশু ও মহিলাদের সমস্যা
- ত্বক-চুলের সৌন্দর্য রক্ষা

• তিনটি ভিন্ন স্বাদের ধারাবাহিক
• গল্প • ভ্রমণ • বিশেষ রচনা


# সাপ্তাহিক বর্তমান

৭ ডিসেম্বর ২০২৪ • দাম ১০ টাকা


## ১০০ রোগ নিরাময়ে
## হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ

• সুগার • প্রেশার
• গ্যাস-অম্বল • ব্যথা-বেদনা
• শিশু ও মহিলাদের সমস্যা
• ত্বক-চুলের সৌন্দর্য রক্ষা

# সাপ্তাহিক বর্তমান

## সূচিপত্র

বর্ষ ৩৭ • সংখ্যা ৩০
৭ ডিসেম্বর ২০২৪

### প্রচ্ছদ নিবন্ধ


• ১০০ রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ ১০
ডাঃ আশীষ শাসমল,
ডাঃ আবদুর রহমান,
ডাঃ নবনীতা মহাকাল


### ধারাবাহিক

• আমি ও আমি ২৩
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
• টিমোথি ও আখতার গোঁসাই ৪৬
দেবতোষ দাশ
• বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে ৫১
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত


### সিনেমা ও টিভি

• জমজমাট কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ৬০
• ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী পরিবার ৬৩

### বিশেষ রচনা


• প্রাচীন মিশরের নারীদের কথা ২৮
দীপঙ্কর বসু
• বিখ্যাত দুই অসম বিবাহ ৪২
কুমারেশ মণ্ডল
• বাংলার 'ছেলে ভুলানো' ছড়া ৪৯
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়


### গল্প

• ফেরা ৩৮
মৃত্তিকা মাইতি


### খেলা

• আইপিএল নিলামে ইতিহাস ঋষভের ৫৬


### ভ্রমণ

• পাথর কাব্যের দেশ খাজুরাহ ৩২
শ্যামাশ্রী দত্ত


### নিয়মিত বিভাগ


অমৃতকথা ২ চিঠি ৩ শব্দ ৪
বইপাড়া ৬ সুখে থাকুন ২২ সাম্প্রতিক ৩৭
সংস্কৃতি ৫৮ ভাগ্যচক্র ৬৪



প্রধান সম্পাদক : হিমাংশু সিংহ
সম্পাদক : তাপসী দাস
সহকারী : ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, গুঞ্জন ঘোষ, অয়নকুমার দত্ত ও অনির্বাণ রক্ষিত
শিল্প বিভাগ : সোমনাথ পাল, সুব্রত মাজী ও চন্দন পাল
প্রচ্ছদ : সোমনাথ পাল

Editor: Tapasi Das
Printed and Published by Jibananda Basu on behalf of
**Bartaman Private Limited**
6 J.B.S Haldane Avenue, Kolkata-700105
Ph-2251 3292/93
RNI NO.48049/88
7 December 2024. 37 Years. 30 Issue

# ধেনুকাসুর ও কৃষ্ণ

ব্রহ্মপুরাণে একটি অসাধারণ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কাহিনি অনুসারে একবার বলরাম ও কৃষ্ণ একসঙ্গে গোচারণে গিয়েছিলেন। গোচারণ করতে করতে তাঁরা 'তালবন' নামে এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সেই বনের মধ্যে ধেনুক নামে নরমাংস ভোগী এক রাক্ষস বাস করত।

বলরাম ও কৃষ্ণ সেই বনে প্রবেশ করে দেখলেন বনটিতে প্রচুর ফলের গাছ। আর সেই বৃক্ষগুলি একেবারে ফলে পরিপূর্ণ। খানিকটা অবাক হয়ে তাঁরা ভাবলেন, আচ্ছা, কেউ কি এই বনের ফল সংগ্রহ করে না? এত সুস্বাদু ফল বৃক্ষেই শোভা পায় কী করে?

কৃষ্ণ ও বলরামের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গী গোষ্ঠ বালকেরা বলল, 'এই বন ধেনুক নামে এক রাক্ষসের অধীন। সেই রাক্ষস বনটিকে রক্ষা করে বলে কেউ এই বনে প্রবেশ করতে পারে না। তার ভয়ে এদিকে কেউ আসে না বলেই এত ফল গাছ ভরে থাকে।'

গোপবালকদের কথা শুনে বলরাম আর কৃষ্ণ সচেতন হলেন। তাঁরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা, দেখ দেখ, কী সুমিষ্ট ফল! এর গন্ধে চারদিক মাতোয়ারা। আমরা এই ফল খাব!'

বলরাম আর কৃষ্ণ একথা বলা মাত্রই গোপবালকেরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। স্বাদু ফল খেতে কার না ইচ্ছে হয়! তবে তালবনে তালই ফলেছে প্রচুর। তাই কৃষ্ণ গোপবালকদের তাল সংগ্রহ করতে আদেশ দিলেন।

আদেশ দেওয়া মাত্রই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তালগুলি আপনা আপনিই বলরাম ও কৃষ্ণের সামনে পড়তে শুরু করল।

তাল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভরূপী চার পা বিশিষ্ট ধেনুকাসুর সেই স্থানে উপস্থিত হল। রাগে প্রকম্পিত হয়ে ধেনুকাসুর গজগজ করতে লাগল, কার এত বড় সাহস যে, আমার তালবনে প্রবেশ করে?

বলরাম ও কৃষ্ণ যেখানে তাঁদের সখাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ধেনুক সেখানে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণকে দেখে মহাক্রোধে তার পিছনের দু'পা দিয়ে কৃষ্ণের বক্ষস্থলে আঘাত করে বসল। আঘাত করল বটে, কিন্তু তাতে বলরাম ও কৃষ্ণকে এতটুকু বিচলিত করতে পারল না। উপরন্তু কৃষ্ণ সেই আঘাত পেয়ে পিছনে তাকালেন এবং পর মুহূর্তে ধেনুককে জাপটে ধরে আকাশের দিকে তালবৃক্ষের কাছে ছুড়ে দিলেন। সেই আচমকা ধাক্কায় ধেনুক সঙ্গে সঙ্গে আকাশগামী হয়ে একটি তালগাছের উপরেই প্রবল বেগে পড়ে প্রাণত্যাগ করল।

তার দেহের আঘাতে কত তাল যে মাটিতে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। চারদিকে সেই তাল পতনের শব্দ ও ধেনুকের মুখ নিঃসৃত চিৎকার তালবনে প্রতিধ্বনিত হল।

ছবি : সুব্রত মাজী

ধেনুক রাক্ষস কিন্তু একাকী সেই বনে থাকত না। সঙ্গে তার স্ত্রী-পুত্র ও অনেক আত্মীয় স্বজনও ছিল। তারা ধেনুকের আর্তনাদ শুনে দ্রুত সেখানে ছুটে এল। এসে তারা যখন কৃষ্ণ-বলরামকে গোপবালক সহ সেই স্থানে দেখতে পেল, তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এরাই ধেনুকের হত্যাকারী। সেই চারপেয়ে অসুরের দল তখন একে একে বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল।

কৃষ্ণ অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে তাদেরও ধেনুকের মতো তাল গাছে ঝুলিয়ে দিলেন। এতগুলি অসুরের দেহের ভারে এত তাল পড়ল যা দেখে গোপ বালকরা আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে লাগল।

সেই তালের গন্ধে মৌমাছি আর ভ্রমরের আনন্দ দেখে কে! চারদিক তালের গন্ধে ম ম করতে লাগল। কৃষ্ণ সেই তালবনকে অসুর শূন্য করলেন। সেইসঙ্গে দেখলেন, অন্য ফলদানকারী বৃক্ষ থাকলেও এই বনে তালগাছই অধিক। তাই তালবৃক্ষ যেহেতু ভূমিতে বেশি স্থান অধিকার করে না, সেইজন্যে একটা উপায় ঠিক করে তিনি গোপবালকদের বললেন, 'বৃক্ষের নীচে অনেক জমি পড়ে আছে। আমরা এই তালবনের ভূমি কর্ষণ করব। আর কর্ষিত ভূমিতে শস্যবীজ ছড়ানো হবে।'

কৃষ্ণের আদেশে গোচারণ বন্ধ রেখে সকল গোপ বালক তালবনের জমি চাষযোগ্য করার কাজে নেমে পড়ল। একসময় জমি তৈরি হলে সকলে মিলে শস্য বপন করতে শুরু করলেন।

দিন যায় মাস আসে। কয়েকমাস পরে মরুসদৃশ খেত সোনার ফসলে হাসতে লাগল। কৃষ্ণের ধেনুকাসুরের বধের ফলে বন্ধ্যা ধরিত্রী ফলবতী হল।

**পূর্বা সেনগুপ্ত**

• চিঠি

## অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক কেন

সাপ্তাহিক বর্তমানে ২৬ অক্টোবর ২০২৪ সংখ্যায় 'অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক বাড়ছে কেন?' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে বিশদে জানতে পারলাম আজকাল কেন অল্পবয়সিরা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হচ্ছেন। ছোটবেলায় পড়েছি 'স্বাস্থ্যই হল আসল সম্পদ'। কিন্তু আজকাল প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে শামিল হচ্ছেন প্রায় সকলেই। অন্যের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতায় মনের উপর চাপ পড়ছে প্রবল। নিজের শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি একটু যত্নশীল হতে, অন্তত কিছুটা সময় ব্যয় করতে তাও সম্ভব হয়ে উঠছে না অনেকেরই। তাই নিজের অজান্তে দানা বাঁধছে হার্টের সমস্যা। অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক সম্প্রতি বেশ বেড়েছে। দেখা যায় হার্টের সমস্যা নিয়ে যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই কমবয়সি। জিনগত বা জন্মগত কারণে হার্টের অসুখ রয়েছে এমন মানুষ ছাড়া যাঁদের পরে কোনও কারণে হার্টের অসুখ ধরছে, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে ২০-৪০ বছর বয়সি তরুণ, তরুণীরা—এমনটাই অভিমত বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের। একদিকে, প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে, অন্যদিকে ওষুধের ক্ষেত্রটিতে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন হার্টের সমস্যা দেখা যেত শুধুমাত্র ৬০ বছরের বেশি বয়সিদের মধ্যে। কিন্তু আজকাল, হৃদরোগ ৪০ বছরের কম বয়সিদেরও গ্রাস করছে। শৈশবের হার্টের সমস্যার অনেক কারণ রয়েছে অনেকের মধ্যে। হৃৎপিণ্ডের শত্রু রক্তচাপ, ডায়াবেটিস। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে এই দু'টি সমস্যা না থাকলেও অনেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তরুণ-তরুণীদের হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে পরিবর্তনশীল জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং ব্যায়ামের অভাব। অনেক সময় অতিরিক্ত ব্যায়ামও একটি কারণ হতে পারে। এরাই হল যুবকদের হৃদয়কে ঘিরে থাকা শত্রু। গত কয়েক দশকে খাদ্যাভ্যাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। টাটকা শাকসব্জি ও ফল খাওয়ার অভ্যাস কমে গিয়েছে। ডিপ ফ্রায়েড আইটেম, বেকারি আইটেম এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া এখন ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছে। এর ফলে ওজন বাড়ছে। কোলেস্টেরল এবং শর্করার মাত্রা সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। তরুণরা প্রচণ্ড মানসিক চাপে রয়েছেন। পারিবারিক, আর্থিক সমস্যা, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, পেশাগত সম্পর্ক নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার বাড়ছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চাপও হার্ট অ্যাটাকের একটা কারণ। ছোটদের বেশি মাত্রায় তেল, ময়দা, চিনি জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো বন্ধ করা দরকার, না হলে ছোট থেকেই ওরা স্থূলকায় হয়ে পড়বে। এর সঙ্গে ওদের একটু খেলাধুলার দিকেও নজর দিতে হবে অভিভাবকদের।

**উৎপল মুখোপাধ্যায়**
**চন্দননগর, হুগলি**


## সংসদ-এর ছোটোদের বই

দীপান্বিতা দে
**তোমাদের বিবেকানন্দ** ₹ 140

পীতম সেনগুপ্ত
**তোমাদের রামমোহন** ₹ 140

ডা. অসীম কুমার দাশগুপ্ত
**হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার কথা** ₹ 250

শান্তনু বসু
**বাজিপুরের আজব কাহিনি** ₹ 250

উল্লাস মল্লিক
**কিরুর কীর্তি** ₹ 130

গৌর বৈরাগী
**তিনু পুলিশের বন্দুক** ₹ 95

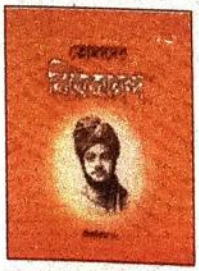

শিশির বিশ্বাস
**কে তিনি** ₹ 150

দীপান্বিতা রায়
**বড়োমার বাক্স** ₹ 140

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়
**কালো রাজহাঁস** ₹ 150

শ্যামল চক্রবর্তী
**অপরাজিত বিজ্ঞানীরা** ₹ 175

রাজেশ বসু
**গুয়াটেমালার অরণ্যে** ₹ 150

সুপ্রিয় চৌধুরী
**দে ছুট** ₹ 140

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ ফোন : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫
e-mail: ss_samsad@yahoo.in Facebook: Samsad Books

## এক টু জানুন এক টু ভাবুন

# রাতের আকাশে সূর্যের আলো

আমাদের জীবন দিন ও রাত অনুযায়ী চলে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দিন শেষ হয়ে রাত আসে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন জায়গা আছে যেখানে কয়েক মাস সূর্য অস্ত যায় না। এই সময় এসব স্থানের দৃশ্য দেখার মতো। কোথায় অবস্থিত সেইসব স্থান। এমন চমৎকার ঘটনা ঘটে কোন কোন দেশে? সাধারণত পৃথিবীর ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত। কিন্তু এমনও জায়গা আছে দিনের ২৪ ঘণ্টাই আকাশে থাকে সূর্যের উপস্থিতি। সেই স্থানগুলিকে নিয়েই আলোচনা করা হল।

**১. নরওয়ে:** আর্কটিক সার্কেলে অবস্থিত নরওয়েকে বলা হয় নিশীথ সূর্যের দেশ। এখানে মে মাসের শেষ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত একটানা ৭৬ দিনের জন্য সূর্য কখনও অস্ত যায় না। নরওয়ের স্যালবার্ডে ১০ এপ্রিল থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত একটানা সূর্যের আলো থাকে।

**২. আইসল্যান্ড:** ইউরোপের বৃহত্তম দ্বীপগুলির অন্যতম আইসল্যান্ড। যেখানে ২৪ ঘণ্টাই সূর্যের আলো থাকে। গ্রীষ্মকালে আইসল্যান্ডের রাতের আকাশেও থাকে সূর্যের আলো। এখানে জুন মাসে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। মাসভর দিন বিরাজ থাকে আইসল্যান্ডে।

**৩. ব্যারো, আলাস্কা:** মে মাসের শেষ থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু নভেম্বরের শুরু থেকে পরবর্তী ৩০ দিন আবার এখানে সূর্য ওঠে না এবং এটি 'পোলার নাইট' নামে পরিচিত। এর অর্থ হল শীতের মাসগুলিতে সমগ্র দেশ অন্ধকারে ডুবে থাকে।

**৪. ফিনল্যান্ড:** ফিনল্যান্ডও মে মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত একটানা প্রায় ৭৩ দিন রৌদ্রোজ্জ্বল থাকে।

**৫. নুনাভুত, কানাডা:** নুনাভুত কানাডার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত একটি সুন্দর জায়গা। আর্কটিক সার্কেল থেকে প্রায় দুই ডিগ্রি উপরে অবস্থিত এই অঞ্চল। এই জায়গাটি প্রায় দুই মাস ধরে একটানা অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাই সূর্যালোক পায়।

**প্রশ্ন**

১. কোন দেশ উদীয়মান সূর্যের দেশ হিসেবে পরিচিত?
২. উত্তর গোলার্ধে বছরের সবথেকে ছোট দিন কবে?
৩. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে বায়ুমণ্ডলে লালভাবের কারণ কী?
৪. সূর্যোদয়ের একটু আগে সূর্যকে দেখতে পাওয়ার কারণ কী?
৫. কোন দেশ সূর্যের সবথেকে কাছে অবস্থিত?

---

**উত্তর**

১. জাপান।
২. ২২ ডিসেম্বর।
৩. আলোর বিক্ষেপ।
৪. আলোর প্রতিসরণের জন্য।
৫. ইকুয়েডরের চিম্বোরাজো।

**অনির্বাণ রক্ষিত**

## শব্দপ্রবাহ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ | ২ | | | | ৩ | ৪ | ৫ | |
| ৬ | | | | ৭ | ৮ | | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | | | ১২ | | | ১৩ | | |
| | ১৪ | | ১৫ | | | ১৬ | | | |
| ১৭ | | | ১৮ | ১৯ | ২০ | | | ২১ | ২২ |
| | | | ২৩ | | | | | | |
| | ২৪ | ২৫ | | | | ২৬ | ২৭ | ২৮ | |
| ২৯ | | | | ৩০ | ৩১ | | ৩২ | | ৩৩ |
| ৩৪ | | | | ৩৫ | | | ৩৬ | | |
| | ৩৭ | | | | | ৩৮ | | | |

**সূত্র:**

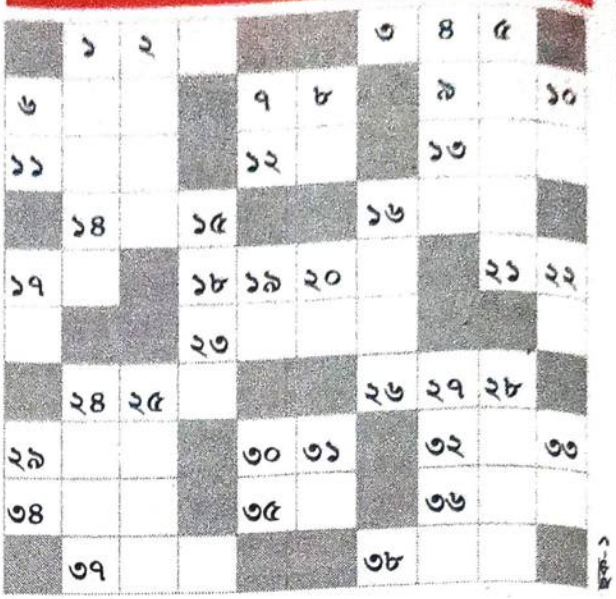

**পাশাপাশি:** ১ খুঁটি ৩ শোভাকর ৬ ভূষিতা ৭ দেবতা ৯ হাবভাব যুক্ত চলন ১১ পাট গোত্রীয় গাছ ১২ অপ্রীতিকর ১৩ যা ভুলিয়ে দেয় ১৪ বাহির হওয়া ১৬ বিবাহ বিচ্ছেদ ১৭ প্রীতিকর ১৮ এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার খোলা গাড়ি ২১ সুন্দরী নারী ২৩ সবসময় ২৪ ছুতোরের যন্ত্র ২৬ মীমাংসা ২৯ মগ্ন, নিবিষ্ট ৩০ সরস্বতী ৩২ ৯-সংখ্যক ৩৪ বন্দুকধারী ৩৫ পুলিসের আক্রমণ ৩৬ পরিহাস ৩৭ তীরে উপস্থাপিত ৩৮ লাঘব।

**উপর-নীচ:** ১ একাগ্রতা ২ সংযত ব্যবহার ৪ দিশাহারা ৫ সরোবর ৬ পরিশোধ বা প্রতিশোধ ৭ গমন, পথ ৮ খাওয়া হয়েছে এমন ১০ কতিপয় ১৫ শ্রীকৃষ্ণ ১৬ পদ্ম ১৭ আবরণ ১৯ শুকিয়ে যাওয়া ২০ জলাধার ২২ তাঁত বোনার যন্ত্র ২৪ পাতালের গঙ্গা ২৫ স্বর্গীয় দূত ২৭ বাহুর অলংকার ২৮ ছুটছে এমন ২৯ ধারণা ৩০ অশ্ব রথ ইত্যাদি বাহন ৩১ মুখর ৩৩ অনিষ্টকারী পতঙ্গ।

**শ্যামাপ্রসাদ দাশ**

• **গত সপ্তাহের সমাধান**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | না | র | দ | | | প্রা | বৃ | ট | |
| চ | | স | র | মা | | ক | ষ | | ক |
| ম | জু | ম | দা | র | | | বা | চা | ল |
| ক | ট | | লা | | আ | ব | হ | মা | ন |
| | | | ন | গ | দ | | ন | র | |
| | বি | দা | | গ | র | ম | | | |
| রা | জ | ন | ন্দ | ন | | হা | | চা | পা |
| ম | ন | সা | | | জ | মা | খ | র | চ |
| দা | | গ | লা | | বা | ন | র | | ক |
| | সু | র | ক্ষা | | | ব | জ | রা | |

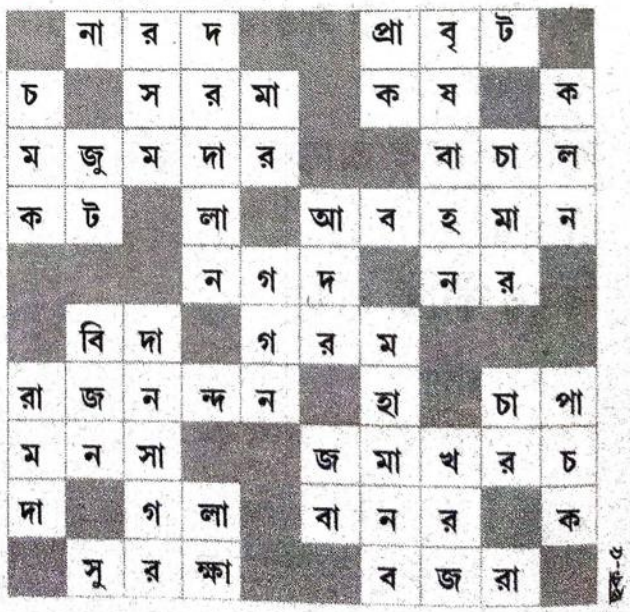

আসন্ন বইমেলা উপলক্ষ্যে | এই উপলক্ষ্যে ২৫% বিশেষ ছাড় | অনলাইনে বই পাওয়া যায়।
9330792527

রবীন্দ্র-রচনাবলী
১২ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ৫১০০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপে, ভালো কাগজে, ঝকঝকে ছাপা, সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন।
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সমগ্র
রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র ৩৩৩
গল্পগুচ্ছ ৩৫৩
সঞ্চয়িতা ৩০০ গীতবিতান ৩৫০
রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দুই খণ্ডে ৫০০
সুনির্বাচিত
রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি
বাছাই ৫০২টি গানের স্বরলিপি ২০০
মানিক রচনাসমগ্র
৬ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ২৪০০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপ, ভালো কাগজে, ঝকঝকে ছাপা, সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন।
মানিক উপন্যাস সমগ্র
৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ১৪০০
মানিক গল্প সমগ্র
২ খণ্ডে ৭০০
মানিক কিশোর রচনা সমগ্র
অবনীন্দ্র রচনাবলী
প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে সমাপ্ত
প্রথম খণ্ড ৪০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৪০০
অবনীন্দ্র কিশোর রচনা সমগ্র
বিভূতি রচনাবলী
৬ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ১৯০০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপে ভালো কাগজে ঝকঝকে ছাপা সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন
বিভূতি উপন্যাস সমগ্র
প্রথম খণ্ড ৫০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০
বিভূতি গল্প সমগ্র
প্রথম খণ্ড ৩৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫০
বিভূতি কিশোর রচনা সমগ্র ২০০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গল্পসমগ্র (অখণ্ড) ৬০০
বুদ্ধদেব গুহ
বারোটি উপন্যাস
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
দশটি কিরীটী উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবীর
সেরা বারোটি উপন্যাস
উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র
১ম ৩০০, ২য় ৩০০,
সুকুমার রচনা সমগ্র
শরৎ রচনা সমগ্র
১ম ৪০০, ২য় ৪০০, ৩য় ৪০০

বিশ্ব ভ্রমণ ৫০০
টুরিস্ট গাইড
সুখময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত
জাতক সমগ্র ৫০০
বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র
স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনার সুললিত অনুবাদ দুই খণ্ডে - ৭০০
পৃথ্বীরাজ সেনের
একান্নপীঠ ও বাংলা জ্যোতির্লিঙ্গ
মহাতীর্থ কালিঘাট
সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ ও সাধক বামাক্ষ্যাপা
অন্নতীর্থ কামাখ্যা
গীতাশাস্ত্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষের
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অখণ্ড সংস্করণ ৪০০
পুরাণ সমগ্র ১২০০
সচিত্র কাশীদাসী মহাভারত ১০০০
সচিত্র সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণ
শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ৫০০
চৈতন্য চরিতামৃত ২০০
শ্রীম কথিত
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪৫০
বীথিকা ভট্টাচার্য
ভারতের সাধক-সাধিকা
১ম ৩০০, ২য় ৩০০ ৩য় ৩০০
জীবনানন্দ দাসের
কাব্য সমগ্র ৫০০
উপন্যাস সমগ্র
গল্প সমগ্র ৫০০
পরশুরামের
গল্প সমগ্র (অখণ্ড) ৪০০
নচিকেতা ঘোষ-এর
ছোটদের বিশ্বকোষ ৪০০
নির্বাচিত জীবনী সমগ্র
দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রতি খণ্ড ৫০০
শতশ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনকথা ৪০০
বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৫০০
ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী ৫০০
বঙ্কিম রচনাবলী
১ম ৫৫০, ২য় ৫০০

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ একশো গল্প সংগ্রহ ৫০০
সমরেশ বসুর
সেরা বারোটি উপন্যাস ১০০০
সেরা দশটি উপন্যাস
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
সেরা বারোটি উপন্যাস ৮০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
সেরা পনেরোটি উপন্যাস ৮০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত
সেরা লেখকদের একশো গোয়েন্দা গল্প ৭০০
সাহিত্যের সেরা গল্প ৭০০
শিবরাম কিশোর রচনা সম্ভার ৫০০
আগাথা ক্রিস্টি রচনাবলী
(১) ৫০০, (২) ৫০০, (৩) ৫০০, (৪) ৩০০
ডেল কার্নেগী রচনাসমগ্র
১ম ৫০০, ২য় ৫০০
হ্যারল্ড রবিন্স রচনা সমগ্র ৫০০
পৃথ্বীরাজ সেন অনূদিত
নিক কার্টার রচনাসমগ্র ৫০০
সিডনি সেলডন রচনাসমগ্র
১ম ৫০০, ২য় ৫০০
মুন্সী প্রেমচন্দ রচনাসমগ্র
মধুসূদন রচনাবলী ২৫০
দীনবন্ধু রচনাবলী ২০০
সুকান্ত রচনা সমগ্র ১৫০
ত্রিভাষা অভিধান ২০০
সুবোধ চক্রবর্তী অনূদিত
মোপাসাঁ রচনাসমগ্র ৫০০
ও হেনরী রচনাসমগ্র ৫০০
জুলভার্ন রচনাসমগ্র ৫০০
এডগার অ্যালান পো রচনাসমগ্র
শেক্সপীয়র রচনাসমগ্র ৫০০
নচিকেতা ঘোষ অনূদিত
শার্লক হোমস রচনাসমগ্র ৫০০
সরস্বতী রায় অনূদিত
হিচকক রচনাসমগ্র ৫০০
জিম করবেট সমগ্র ৫০০
টারজান সমগ্র ৪০০
পৃথ্বীরাজ সেন অনূদিত
জেমস হেডলি চেজ রচনাসমগ্র
১ম ৫০০, ২য় ৫০০, ৩য় ৪০০, ৪র্থ ৪০০
জেমস বন্ড রচনাসমগ্র ৫০০
বৃহৎ কুটির শিল্প ২৫০
আলেকজান্ডার ডুমার রচনা সমগ্র
দুই খণ্ডে সমাপ্ত প্রতি খণ্ড ৪০০

দেবাশিস সরকার অনূদিত
সচিত্র সহস্র এক আরব্য রজনী
মহাভারতের প্রেম ও যৌনতা ১৫০
রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর গোপন প্রেম ১০০
পৃথ্বীরাজ সেন
বিশ্বের কামসূত্র সমগ্র ৩০০
শত রজনীর বারবনিতা ১০০
নিষিদ্ধ প্রণয়... নিষিদ্ধ উপন্যাস
সুমন্ত সেন অনূদিত
সেক্স ম্যানুয়াল লাভ অ্যান্ড ম্যারেজ
রাধারমণ রায়'এর
বাঈজী এলো কলকাতায় ১০০
অশোককুমার ঘোষ'এর
বেকমনের মুড়ুক্ষয় প্রাকৃতিক চিকিৎসা
বিশ্বত্রাস হিটলার
ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ২০০
সেরা লেখকদের একশো ভূতের গল্প ৩৫০
শতাব্দীর সেরা রূপকথা ৩৫০
শতাব্দীর সেরা হাসির গল্প ৩৫০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত
রহস্য গোয়েন্দা জমজমাট
শতাব্দীর সেরা গোয়েন্দা গল্প ৩৫০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প ৩৫০
রোগমুক্ত রেকী চিকিৎসা
পৃথ্বীরাজ সেন
বিশ্ব মনীষীর বাণী সমগ্র ৪০০
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী'র
আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা
বিষয় ডায়েবেটিস
বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কার
কৃষ্ণ গহ্বর
বিজ্ঞান বিচিত্রা
বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী
সেরা দশটি রহস্য উপন্যাস
খেলাধুলার আইনকানুন
বৃহৎ আইন কানুন
বাৎস্যায়নের হস্তরেখা অভিধান
লাল কিতাব
বাহারি রান্না সমগ্র
বৃহৎ ইন্দ্রজাল
দাদার দাদাগিরি কুইজ
১ম ২০০, ২য় ১৭০
বিশ্ব কুইজ সমগ্র
কুইজ সমগ্র ২৫০
বিশ্ব রেকর্ড সমগ্র
সায়েন্স কুইজ সমগ্র

কামিনী প্রকাশালয়
৫ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : ০৩৩ ২২৪১৩৩৩২

## বৈষ্ণব গবেষণার এক অপরিহার্য বই

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ ৪০০/

গায়ত্রী-ঊ পাসনা ৩০০/
পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী
কৃত ও উপদিষ্ট
ব্রহ্মর্ষী সত্যদেবের
সু-নির্বাচিত রচনা সমগ্র
৪৫০/

শ্রীবাম লীলা ৬৫০/
শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫০/

শব্দব্রহ্ম ও ব্রহ্মানুভূতি
এবং
আত্মসমর্পণ যোগ
বা সরলযোগপন্থা ২৫০/
শ্রী জীতেন্দ্রনাথ সেন

অষ্টাবক্র সংহিতা ২০০/
শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য
ওঁ তৈলঙ্গস্বামী ২৫০/
ওঁস্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী

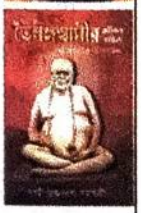

কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ ২৫০/
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত
শ্রী শ্রী যোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ ৫০০/
শ্রী অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা
শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ ৭০০/
মানবতত্ত্ব ৫০০/
শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জপ রহস্য বা জপবিজ্ঞান ২৫০/
স্বামী সন্তদাস বাবাজী
সরল জ্যোতিষ শিক্ষা ৮৫০/
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও অনূদিত

ছট্ পূজা কীও কেন ? ৬০/
সুনীল রায় ও বিভাষ মজুমদার

প্রাচী পাবলিকেশনস | ৯৩৩৯১০৮০২৪


## শিশু সাহিত্য ও সুকুমার রায়

সুকুমার রায় শুধু শিশু সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী ধারার একজন জনপ্রিয় ও সর্বজনবিদিত নাম। সাহিত্যগুণে তিনি শিশু সহ সব ধরনের পাঠকের কাছেই সমাদৃত। অল্প বয়স থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা, সম্পাদনা সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শী। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাড়ি জমান। ১৯১৩ সালে দেশে ফিরে যুক্ত হন 'সন্দেশ' পত্রিকার সঙ্গে। তিনি নিয়মিতভাবে 'সন্দেশ' সহ বহু পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। কিন্তু জীবদ্দশায় কোনও বই-ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯২৩ সালে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পর প্রকাশিত হয় 'আবোল তাবোল' কাব্যগ্রন্থ।

সুকুমার রায়ের প্রয়াণ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কবিতিকার প্রয়াস 'প্রয়াণ শতবর্ষে সুকুমার রায়'। বইটিকে মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এতে রয়েছে সুকুমার রায়ের 'জীবনচর্চা', 'সৃষ্টি ও সাহিত্য', 'সময় সম্পর্কের আলো', 'পরাধীনতার গ্লানি', 'ভালোবাসার বন্ধন', 'আবোল তাবোল' ও 'সন্দেশ এবং বাকি যা কিছু'। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন প্রবালকান্তি হাজরা, পার্থসারথি দাশ, গীতা খাঁড়া, গুরুপদ জানা, দীপঙ্কর প্রধান, অসীমকুমার মান্না, মধুসূদন জানা প্রমুখ। 'শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় ও আবোল তাবোলের শতবর্ষ' প্রবন্ধে স্বপনকুমার মণ্ডলের লেখায় ধরা পড়েছে 'আবোল তাবোল'-এর ইতিহাস। ছাত্র সুকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় থেকেই 'ননসেন্স ক্লাব' নামের একটি সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে পত্রিকা। সেখানেই তাঁর 'আবোল তাবোল' ছড়া চর্চার শুরু।

তাঁর বহু লেখার মধ্যে অনন্য সৃষ্টি ননসেন্স ছড়া সংকলন— 'আবোল তাবোল'। যা আজ শতবর্ষ অতিক্রান্ত। এই কাব্যগ্রন্থে ছড়ার সংখ্যা ৫০টি, বেনামে ৭টি। ননসেন্স ছড়ার বৈশিষ্ট্য এখানে ছন্দ বা অন্তমিল থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—

'আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা/ স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।'

তাঁর হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফ চুরি নিয়ে যা কাণ্ডকারখানা তার ছায়া আজও আমরা অন্যভাবে অফিস আদালতে দেখতে পাই। 'সৎ পাত্র'-তে তিনি লেখেন— 'শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে— /তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে?/গঙ্গারামকে পাত্র পেলে।/ জানতে চাও সে কেমন ছেলে?'

পাত্রের গুণাগুণ বর্ণনা তাঁর কবিতার মধ্যে আছে। তাছাড়া পড়াশোনা নিয়ে তিনি লেখেন—'বিদ্যেবুদ্ধি বলছি মশাই—/ ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়/ উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে/ ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।'

এই সমস্ত ছড়া যা 'আবোল তাবোল' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তার বেশিরভাগই তিনি অসুস্থ থাকাকালীন

লিখেছিলেন। এই সময়েই জন্ম হয় 'আবোল তাবোল', 'হযবরল', গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি।

বইটিতে সুকুমার রায়ের পুরো জীবনীকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন লেখকরা। যেখান থেকে অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পাবেন পাঠক।

**প্রয়াণ শতবর্ষে সুকুমার রায় ॥ সম্পাদনা: জয়দেব মাইতি ॥ কবিতিকা (খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৩২) ॥ ৩০০ টাকা।**

**• অনির্বাণ রক্ষিত**

## সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন রকমফের রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বড় গল্প, ছোট গল্প, অণু গল্প ইত্যাদি।

করোনাকাল ও পরবর্তী সময়ে লেখা **রবীন বসুর** বই **'অণুচল্লিশ'**। **'রা'** প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বইটিতে মোট ৪০টি গল্প স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে— 'পেয়িং গেস্ট', 'বিকল্প প্রেম', 'লাভ', 'প্রতিকৃতি', 'লজ্জা', 'ভুল', 'সাক্ষী', 'জিগালো সার্ভিস', 'অন্ধকারে আলো', 'সারোগেট মাদার', 'উপহার' ইত্যাদি। 'মিথ্যে' গল্পে অয়ন ও বিদিশার কথা আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘ দশ বছর পর দু'জনের সাক্ষাৎ। বিদিশা বাবার অসুস্থতার কথা বলে তার বন্ধু বান্ধবদের থেকে নেশা করার জন্য টাকা আদায় করে। মিথ্যা কথা বলে টাকা আদায়ের খবর অয়ন জানতে পারলে তাকে এক লাখ টাকার চেক ধরিয়ে দেয়। আর বিদিশাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলে অয়ন। শেষমেশ বিদিশাও এই ঘটনার জেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই এক নিঃশ্বাসে পড়ে নেওয়া যায়।


দেবলোকের অমৃতসন্ধানে -খ্যাত
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের
মহাপীঠ কামাখ্যার তন্ত্ররহস্য সন্ধানে ২৫০
(কামাখ্যা, গৌহাটি, মায়ং ভ্রমণ ও সেখানকার তন্ত্রচর্চার বিবরণ)
20% এ বই পেতে WhatsApp করুন
জয় মা তারা পাবলিশার্স
9153391909
মহেশ, দে বুক স্টোর (দীপুদা)


বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বই-এর বাংলা অনুবাদ
জনস্বাস্থ্যকর্মী
কর্ম নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা
মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র
অন্যান্য স্বাস্থ্যের বইয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন
অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কোলকাতা-৭০০০৭৩
Phone : 4064-4147
E-Mail : contact@academicpublishers.in
Books are available online – www.academicpublishers.in

"নেতাজির রহস্য সন্ধানে"
হরি শঙ্কর রায় | মূল্য: ৩০০ টাকা | M-7439281809
"ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম বিরল ঘটনা যাহা নেহেরুর পরিকল্পনায় ঘটেছিল।"
প্রাপ্তিস্থান: দেব লাইব্রেরী, আদি দে বুক, ইউ এন ধর ও বই মেলার স্টলে মডার্ন বুক, পারুল প্রঃ, ও বহুবচন, গীতাঞ্জলি তে।

পত্রভারতীর বইমেলায় হইচই
সমরেশ মজুমদারের
গোপন খাতার আশ্চর্য আবিষ্কার
জলসা 299/-

আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঃ ৬ ডিসেম্বর।
স্টারমার্ক, সাউথ সিটি মল, সন্ধে ৬টা
থাকছেন ঃ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীজাত, মীর এবং প্রচেত গুপ্ত
অশেষ সমরেশ 450/- গল্প সমগ্র ১ 550/- গল্প সমগ্র ২ 595/-
উজাড় 199/- হায় সজনি 225/- হারিয়ে যাওয়া লেখা 490/-
কলিকাতায় নবকুমার সম্পূর্ণ 650/- আগুনবেলা 399/-


অর্পিতা সরকার
প্রেম চিরনবীন। প্রেমিক-প্রেমিকার বয়েস বাড়লেও প্রেম যেন অষ্টাদশীর ভীরু চাহনি।
তোমায় ঘিরে রাতদিন 335/-
এসো না অসময়ে 350/-

অনীশ দেব
গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র 275/-

অভীক দত্ত
এ উপন্যাস শুধু রহস্যকাহিনি নয়, শুধু প্রেমের উপাখ্যান নয়, 'নীপাদের বাড়ি'কে ঘিরে আবর্তিত এক দীর্ঘ জার্নি!
নীপাদের বাড়ি 325/-
পথ হারাবো বলেই 325/-
বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে 495/-



শশধর দত্ত
দুষ্ট দমন দস্যু মোহন 850/-
ক্লাসিক চরিত্র! অ্যাকশনে ভরপুর।
পঞ্চানন ঘোষাল
সব অপরাধ সত্যি 595/-
রোমহর্ষক চারটি লেখা এক মলাটে


পত্রভারতী আসছে আপনার কাছের বইমালায়
কল্যাণী, শিলিগুড়ি, উত্তরপাড়া, চুঁচুড়া, বজবজ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), হেঁজিয়া (পূর্ব মেদিনীপুর), মেদিনীপুর টাউন, আলিপুরদুয়ার এবং অন্যত্র।

QR CODE স্ক্যান করলেই ক্যাটালগ
পত্রভারতী 3/1 কলেজ রো, কলকাতা 9
www.patrabharati.com
9830806799 9433075550

# অসম্ভবের জগতে হেমেন্দ্রকুমার

লেখক শিবরাম চক্রবর্তী হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বাংলা শিশু-কিশোরদের সাহিত্যকে সেই আদ্যিকালের বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর জগৎ থেকে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন হেমেন্দ্রকুমারই। তারপরে আমরা সবাই তারই অনুবর্তী।' হেমেন্দ্রকুমার রায়। বাংলা সাহিত্য জগতের এক নতুন ধারার স্রষ্টা। অবশ্য যে ধারায় তিনি কলম বিস্তার করেছিলেন, তা নিয়ে আজও বিস্তর লেখালেখা হচ্ছে। তিনিই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির পথিকৃৎ। পৃথিবীর এমুড়ো থেকে সেমুড়ো তিনি কাহিনিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর বিপুল রচনারাশি থেকে কিছু উপন্যাস বেছে নিয়ে দু'মলাটে বন্দি করা হয়েছে। 'অ্যাডভেঞ্চার সংগ্রহ'-তে এগারোটি উপন্যাস রয়েছে।

প্রথম উপন্যাস 'নীল সায়রের অচিনপুরে'। আটলান্টিক নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ কোনওদিনও ছিল না। আটলান্টিক মহসাগরের নীচে হারিয়ে যাওয়া দ্বীপ নিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ও উপন্যাস লেখার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। বিমল ও কুমার— এই এক জোড়া গোয়েন্দা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৃষ্টি। যাদের তিনি বারবার বিভিন্ন রহস্য সমাধানে পাঠিয়েছেন।

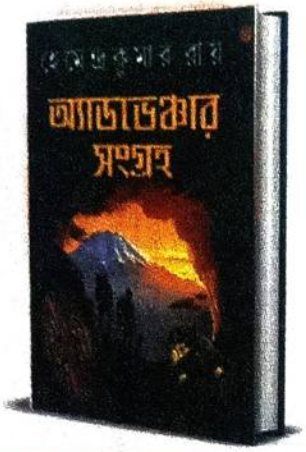


এস এস বোহেমিয়া জাহাজের কর্মীরা আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে এক অজানা শৈলদ্বীপের খোঁজ পায়, যেখানে গিয়ে জাহাজের আট জন নাবিক রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। কিছুদিন পরে জানা যায় জাহাজের ক্যাপ্টেন সহ আরও দু'জনের কেউটে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়। এই কাহিনির সবথেকে আশ্চর্য বিষয় হল ভারতের কেউটে সাপ সেখানে পৌঁছল কী করে! তার থেকেও আশ্চর্য হল দ্বীপের পাহাড়ের সবথেকে উঁচু জায়গায় যারা পা রেখেছিল বেছে বেছে একমাত্র তাদেরই সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। এই রহস্য সমাধানে ডাক পড়ে বিমল, কুমারের।

'সুন্দরবনের রক্তপাগল' উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবন। ধূর্ত ডাকাত মধু ডাকাতের গল্প। যে সুন্দরবন অঞ্চলে ডেরা বেঁধেছে। যার ভয়ে ত্রস্ত ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। জেরিনার কণ্ঠহার মামলায় অভিযুক্ত অবলাকান্ত সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়ে ডাকাত দল তৈরি করে। মধু ডাকাত ছদ্মনামে ডাকাতি শুরু করে। বিমল, কুমার, জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু বেরিয়ে পড়ে সেই মধু ডাকাতকে ধরতে।

'অমাবস্যার রাত' উপন্যাসের কাহিনি মানসপুর গ্রামের ঘটনা থেকে শুরু। যেখানে প্রতি অমাবস্যায় একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়। এই অন্তর্ধানগুলির মধ্যে ভূত ও সাসপেন্সের মিশ্রণ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখবে। বিমল ও কুমার সিরিজের একটু অন্য ধরনের উপন্যাস 'অমাবস্যার রাত'। প্রতি অমাবস্যার রাতে ঘড়ি ধরে ঠিক রাত ১২টায় বাঘের আবির্ভাব হয়, সঙ্গে আসে ডাকাতের দল। তারা শুধু ধরে নিয়ে যায় গহনা পরা মেয়েদের। তারপর আর তাদের কোনও হদিশ মেলে না। বেশ কিছুটা অলৌকিকতার ছোঁয়াও রয়েছে কাহিনিতে।

দশটি খুন। যা পুরোপুরি রহস্যে মোড়া। 'হারাধনের দ্বীপ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। যে মূল খুনি সে সবার সামনে থেকেও অধরা। পরতে পরতে রহস্য। শেষ পর্যন্ত খুনি কে তা জানতে পাঠককেও মগজ অস্ত্রে শান দিতে হবে।

'অসম্ভবের দেশে' উপন্যাসের কাহিনিও সুন্দরবনের এক দ্বীপকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। সুন্দরবনের কাছে মোহনপুরে বিমল শিকারের সন্ধানে যায়। সেখানে গিয়ে এক অজানা জন্তুর খবর পায়, যা কি না বাঘও না, গণ্ডারও না তবে বাঘের থেকেও বড় বেড়ালের মতো। এরপর কাসিম মিয়াঁ নামে এক মাঝির কাছ থেকে জানা যায়, সে নাকি গঙ্গাসাগরের মাঝে এক দ্বীপে একজন লোককে পৌঁছে দেয়, যার কাছে এরকমই এক দানব বেড়াল ছিল। এরপরেই বিমল-কুমার সেই দ্বীপে যাত্রা করে। কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়, তারপর তারা দলবল সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যায়। এবার সঙ্গ নেয় বিনয়বাবু, কমল, রামহরি, বাঘা ও পুলিসের লোক।
তারা পৌঁছয় এক অসম্ভবের দেশে। যেখানে বিজ্ঞানী ধরণীবাবু এক আজব নেশায় মেতেছেন। গ্ল্যান্ড থেরাপি করে হরমোন বাড়িয়ে কিছু বিরাট দানব তৈরি করেছেন এবং করেছেন মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপনও। দানবাকৃতির মানুষের দেখা মেলে, কুমির বানরেরা মানুষের মতো কথা বলে, বিশালাকৃতির জন্তু ঘোরাফেরা করে। নানা ঘটনা ঘটে, বিমল-কুমার মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে আসে এবং শেষে সেই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু হয়।

'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' গল্পে বিমল, কুমার, বাঘা, রামহরি, বিনয় বাবু ও তার মেয়ে মিনুকে নিয়ে তুষার মানবদের দেশে অভিযানের পাড়ি দেয়। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এরা। বিনয়বাবু তার মেয়েকে নিয়ে হিমালয় বেড়াতে যান। কিন্তু সেখানে মিনুকে কারা চুরি করে নিয়ে যায়। মিনু ছাড়াও বেশ কিছু মানুষ উধাও হয়ে যায়। এর পিছনে নাকি কোনও রহস্য রয়েছে। বিমল-কুমার উদ্ধারের জন্য সেখানে যায়। তারা প্রথম ক্লু হিসেবে পায় জঙ্গলের মধ্যে বড় কোনও অতিকায় জীবের পায়ের ছাপ। এরপর একে একে বিনয়বাবু, রামহরি, বিমল ওই দানবদের হাতে বন্দি হয়। পরে কুমারও বন্দি হয়। হিমালয়ের ওই অঞ্চলের দানবরা সপ্তাহে একদিন কুকুর দেবতার পুজো করে ও একটা করে নরবলি দিয়ে সেই মাংস ভক্ষণ করে। এদের হাত থেকে উদ্ধারের গল্পই এর সারমর্ম।

চীনা দেবতা লাও জু র অমৃতের দ্বীপ আর তার সন্ধানে ছয় বাঙালি ও বাঘা অভিযানে যায়। অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তারা। সমুদ্রযাত্রা, জলদস্যু, অজানা পথের হাতছানি অমৃত দ্বীপ উপন্যাসের কাহিনিকে এক অদ্ভুত রহস্যে মুড়ে রেখেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে। পাঠক নিজেই যেন কখন অভিযাত্রী হয়ে গিয়েছে। কাহিনির গঠনশৈলী উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ। তাঁর লেখার মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রেমেন্দ্রকুমার মিত্র বলেছিলেন, 'কালের ব্যবধান ডিঙিয়ে সেসব রচনার আকর্ষণ আজও সে অক্ষুণ্ণ আছে, তার কারণগুলির মধ্যে একটি হল তাদের প্রাণবন্ত সজীবতা। সেসব লেখার প্রতি ছত্রে একটি বলিষ্ঠ প্রাণাবেগ যেন আপনা থেকে ফুটে উঠে।

**অ্যাডভেঞ্চার সংগ্রহ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥**
**দে'জ পাবলিশিং ॥ ৮০০ টাকা।**
**নিজস্ব প্রতিনিধি**

# সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

• সাহিত্যের রংবেরং পাবলিকেশন (৬৯৭/১, মহারাজা নন্দকুমার রোড (উ), কল-৩৫) থেকে প্রকাশিত হয়েছে **হীরেন্দ্রকুমার সান্যালের বই 'মাতৃত্বের সীমারেখা'।** মানবজীবনে নারীর নানা রূপান্তর নিয়ে লেখকের বইয়ের প্রধান চরিত্র সুজাতা। একজন সফল চরিত্র। তবে বাইরের সাজানো গোছানো জীবনের সবটাই সাফল্যের নয়, বাধাতারও পদে পদে মোকাবিলা করেছে সুজাতা। কিন্তু সমস্যার বাধা ঠেলে কী করে সাফল্যকে করায়ত্ত করল? আসলে নারীত্বের মাধুর্য হল তার নানাবিধ গুণপনায়। সেটাই লেখক তাঁর কাহিনিতে চিত্রিত করেছেন। বইটির **দাম: ১০০ টাকা।**

এই লেখকেরই অন্য বই **'অম্ল মধুর স্মৃতি'** একই প্রকাশনা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এটি লেখকের সাতটি ঘটনার এমন এক বিশ্লেষণ যা কখনও অবাক করে কখনও ভাবায়। থিমটি এইরকম, যে কোনও ঘটনা আকস্মিক হতে পারে আবার আভাস দিয়েও হতে পারে। আবার এও মনে হয় ঘটনাটি কেউ ঘটায়নি তো। 'মায়ের হস্তক্ষেপ', 'গোলাম ঝড়ের আভাস মানল না', 'বৈরাগী দম্পতি', 'জগদীশের আতঙ্ক' ইত্যাদি গল্পগুলি ভাবায়। বইটির **দাম: ১৫০ টাকা।**

• **জীজিৎ জানার বই 'কাঁসাই পাড়ের যুদ্ধ'** লবণ সত্যাগ্রহের ইতিকথা। লেখক বিস্মৃত ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন নতুন প্রজন্মের কাছে। ঋজু গদ্যে গল্পবলার ঢংয়ে তিনি অতীত গৌরবকে স্বমহিমায় উপস্থিত করেছেন। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে এই কাজটি বিশেষ মূল্যবান। **প্রকাশক সায়ন্তনী। দাম: ১০০ টাকা।**


আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী
নতুন ভাবে, নব সাজে প্রকাশিত হল
CORE MATHEMATICS
K. C. Nag ₹695
অমূল্য আকর গ্রন্থ, যেন অঙ্কের অভিধান!
কোর গণিত
কেশবচন্দ্র নাগ
• নতুন সংস্করণ • ₹695
আমাদের ইংরেজি বই
সেই পুরানো বইয়ের ৫২তম সংস্করণ
A Text-Book of
Higher English Grammar, Composition & Translation
by P. K. De Sarkar ₹695
Anglo-Bengali Edition • Unabridged Version
Book Syndicate
35 College Street, Kolkata-700 073
✆ 2241 0275 @ booksyndicate.35@gmail.com



দীপ প্রকাশন-এর বই

রহস্য রোমাঞ্চ সম্ভার
হেমেন্দ্রকুমার রায়
দেশ থেকে বিদেশে। কখনো অজানা জঙ্গল আতঙ্ক, কখনো বা অচেনা শত্রু। কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি, কখনো গায়ে কাঁটা দেওয়া অভিযান। জয়ন্ত-মানিক বা বিমল-কুমারের অভিযানের বাইরেও হেমেন্দ্রকুমারের শাণিত কলমে ঝলসে উঠেছে একের পর এক রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী যা আজও পাঠককে নাড়া দেয়।
মূল্য- ১১০০/-

মৃত্যু যখন দুবার আসে
দেবারতি মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞান ইতিহাস ও রোমাঞ্চের মিশেলে রুদ্র প্রিয়ম সিরিজের নতুন উপন্যাস 'মৃত্যু যখন দুবার আসে', যেখানে সমান্তরালে আঁকা হয়েছে প্রাচীন বাংলার এক বিলুপ্ত প্রথা ও সমসাময়িক অদ্ভুত এক সিরিয়াল কিলিং-এর অপরাধ।

মূল্য- ২৭৫/-

মূল্য- ৪৫০/-

তন্ত্রের ব্যবহারিক ইতিহাস
সোমব্রত সরকার
তন্ত্র কখনওই ধর্ম নয়, আচরণ মাত্র। ভারত জুড়ে তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের রীতিপ্রথা, আচার আলাদা ধরনের। আচারক্রমের একটি ব্যবহারিক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। সমস্ত ভাব, আচার ও সাধন পরম্পরা নিয়েই রচিত; তন্ত্রের ব্যবহারিক ইতিহাস আদি থেকে অন্ত।

রাত্রি এবং...
মনীষ মুখোপাধ্যায়
এই বইটিতে রয়েছে ন'টি ভিন্ন স্বাদের ছোটো বড়ো গল্প। যেগুলি ভৌতিক, আধিভৌতিক এবং ভয়ালরসের। অতিপ্রাকৃত নানা দেবদেবী ছাড়াও এই বইয়ের গল্পগুলিতে উঠে এসেছে অন্ধকারের গল্প।




মূল্য- ২৭৫/-

আমাদের প্রকাশনার সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা পেতে স্ক্যান করুন
১নবি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
যোগাযোগ: ২২৪১ ৩৪৯০, ৯১২৩৮১১৭৮১
অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে www.boichitro.in

# ১০০ রোগ নিরাময়ে
# হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ

শরীর হল ব্যাধির মন্দির। সেই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করাই হল আসল কথা। এখন ঋতু পরিবর্তনের সময়। খুসখুসে কাশি, নাক সরসর কিংবা গলাব্যথায় ভুগতে হচ্ছে। তার ওপর ত্বকের শুষ্কতা, মাথায় খুশকি, চুলপড়ার সমস্যা তো আছেই। শীতের সময় অনেকেই আবার মানসিক অবসাদে ভোগেন। হঠাৎ জ্বর, সর্দি, ব্যথা যন্ত্রণা, বমিভাব— তাছাড়া ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, লিভারের সমস্যা, অ্যালার্জি, সন্ধিবাত ইত্যাদি তো লেগেই আছে। গোটা শীতকাল সতেজ থাকতে প্রস্তুতি নিয়েছেন তো? ইমিউনিটি বাড়াতে কী করবেন? কোন সমস্যায় কী ওষুধ খাবেন? ১০০টি দরকারি টিপস দিলেন

ডাঃ আশীষ শাসমল, ডাঃ আবদুর রহমান ও
ডাঃ নবনীতা মহাকাল।

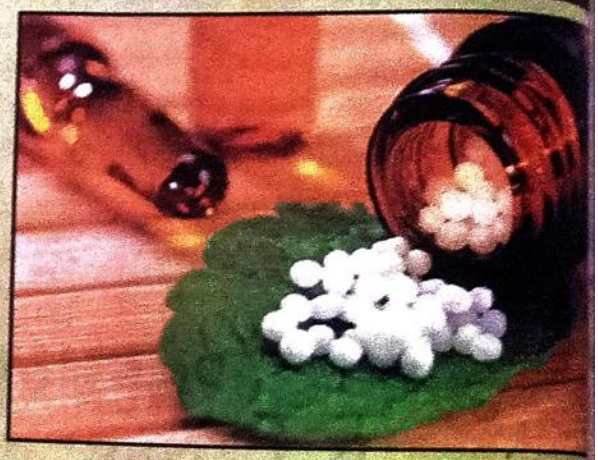

## ডাঃ আশীষ শাসমল

• ছোটদের অসুখ-বিসুখ

১. জ্বর ও সর্দি: বাচ্চাদের বিভিন্ন কারণে জ্বর ও সর্দি হতে পারে, লক্ষণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ওষুধ দিতে পারেন।

• অ্যাকোনাইট: বিশেষ করে শীতকালে হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে জ্বর সর্দি কাশি হলে।

• ব্রায়োনিয়া: ঠান্ডা গরমে জ্বর সর্দি কাশিতে।

• বেলেডোনা: হঠাৎ জ্বর, চোখ-মুখ লাল হলে।

• রাসটক্স: জলে বা বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর সর্দিতে।

২. কাশি: বাচ্চাদের Acute এবং Chronic দু'রকম কাশি সারে হোমিওপ্যাথিতে।

• ড্রসেরা: রাতে শুলে কাশি যখন বেড়ে যায়।

• ম্যাঙ্গানাম অ্যাসিটিকাম: সারাদিন কাশি কিন্তু বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়লে তখন আর কোনও কাশি থাকে না।

• জাস্টিশিয়া: হঠাৎ খুব কাশি, কিন্তু কারণ কিছু বুঝতে না পারলে এটা ব্যবহার করুন।

৩. হাঁপানি বা অ্যাজমা: সঠিক চিকিৎসা করালে বাচ্চাদের হাঁপানি সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। ন্যাসিলিমাম, টিউবার ক্যুলিনাম, ফুজা ইত্যাদি ওষুধ এক্ষেত্রে ভালো কাজ দেয়।

### ছোটদের অ্যালার্জি

৪. অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস: গালে লাল দাগ, চামড়া রুক্ষ, ছোট ছোট ফুসকুড়ি এবং সেগুলি চুলকায়। এগুলি হাত-পা-গলার খাঁজে ক্রমে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সালফার, ন্যাসিলিমাম সোরিনাম ইত্যাদি খুব ভালো কাজ দেয়।

৫. ডাস্ট অ্যালার্জি: ধুলো-বালি ইত্যাদি এবং সঙ্গে ডাস্ট মাইট থেকে অ্যালার্জি হয়। সালফার মেডোরিনাস, থুজা এবং অ্যাকিউট হলে হাউজ ডাস্ট ৩০ ব্যবহার করা যায়।

### ভাইরাস জনিত রোগ

৬. চিকেন পক্স: জল ফোস্কার মতো দেখতে হয়, চুলকানি থাকে সঙ্গে জ্বর থাকে। ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স ভালো কাজ করে।

# রোগ নিরাময়ে
# হোমিওপ্যাথি



ভ্যারিসেলা ৩০ বা ম্যালানড্রিনাম ২০০ প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করুন।

৭. হাম: এক্ষেত্রে বাচ্চাদের জ্বর, সর্দি, কাশি এবং গায়ে ছোট ছোট লাল র‍্যাশ বের হলে বেলেডোনা খুব ভালো কাজ দেয়।

মরবিলিনাম প্রতিষেধক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

৮. মাম্পস: এই রোগে মুখের দু'পাশে এবং কানের নীচের রগ দু'টির প্যারোটিড গ্রন্থি ফুলে যায়। বেলেডোনা, পালসেটিলা খুব কার্যকরী এবং প্যারোটিডিনাম ২০০ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করুন।

৯. বমি: যে কোনও বমির প্রাথমিক ওষুধ হল ইপিকাক। আর সদ্যোজাত বাচ্চার দইয়ের মতো বমি হলে ইথুজা সাইনাশিয়াম ৩০ দিতে পারেন। অনেক সময় বাচ্চারা গাড়িতে উঠলেই বমি করে, তখন পেট্রোলিয়াম ৩০ দিন।

১০. সদ্যোজাত শিশুর কান্না: সদ্যোজাত সারা রাত কাঁদে কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমোয়। এমন হলে জালাপা ৩০ এবং এর বিপরীত অবস্থা হলে লাইকোপোডিয়াম ৩০ ব্যবহার করুন।

১১. ডায়েরিয়া: কোনও কিছু খাওয়ার পর ফুড পয়জনিং হলে আর্সেনিক ৩০। দাঁত ওঠার সময় ডায়েরিয়া হলে ক্যামোমিলা ৩০ আমাশয় হলে অ্যালো সক ৩০ দিন।

১২. কোষ্ঠকাঠিন্য: ম্যাগমিওর ৩× দিতে হবে।

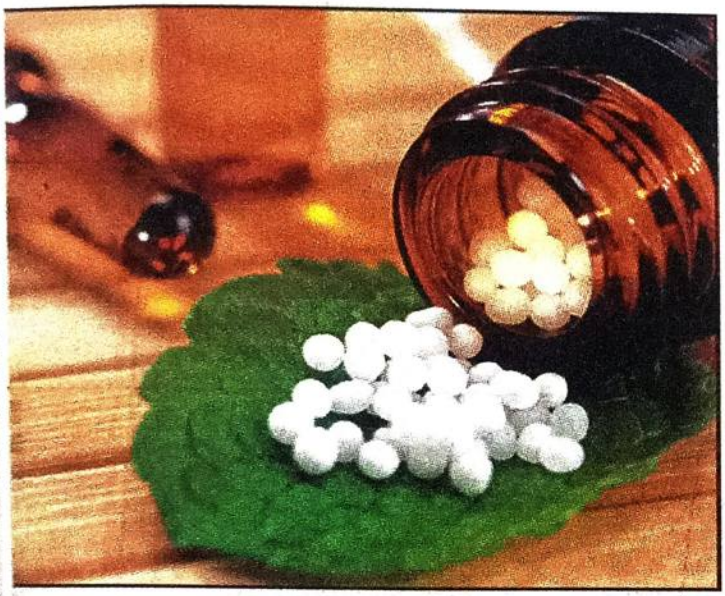

কৃমির সমস্যা হলে সিনা ৩০ দিন।

১৩. টনসিলের সমস্যা: অনেক বাচ্চাই টনসিলাইটিসে ভোগে। সঠিক হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগে টনসিলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে স্ট্রেপ্টোকক্সিন ২০০ ব্যবহার করুন।

১৪. অ্যাডিনয়েড: নাকের পিছন দিকে টনসিলের মতো গ্ল্যান্ড থাকে। এই গ্ল্যান্ডে সংক্রমণ হলে নাক বন্ধ, মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ায় ঘনঘন সর্দি কাশি হয়। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগ সারানো সম্ভব। অ্যাগ্রাফিস নিউট্যানস ওষুধটি খুবই কার্যকরী।

১৫. কানে ব্যথা: প্রত্যেক বাচ্চারই কখনও না কখনও কানে ব্যথা হয়। প্রাথমিকভাবে ভারবাসকাম ৩০ দিতে পারেন।

১৬. দাঁতে ব্যথা: বাচ্চাদের দাঁতে ব্যথা হলে মার্ক সল ৩ এবং প্লানটাপো মাদার লাগাতে হবে।

১৭. আঘাত লাগা: পড়ে যাওয়া, আঘাত লাগা বা থেঁতলে গেলে এবং মাথায় আঘাত লেগে আলুর মতো ফুলে গেলে আর্নিকা ৩০ বারে বারে দেবেন। কোনও জায়গা কেটে গেলে ক্যালেন্ডুলা ৩০। দরজায় আঙুল থেঁতলে গেলে হাইপেরিকাম ৩০ দিলে উপকার হয়।

## বাচ্চাদের নানা আচরণগত সমস্যা

১৮. অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার: এক্ষেত্রে কার্সিনোসিন, এমএমআর, ব্যারাইটা কার্ব ইত্যাদি ভালো কাজ দেয়।

১৯. অ্যাটেনশন ডেফসিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার: ট্যারেনটুলা, জিনকাম মেট, টিউবারকুলিনাম ইত্যাদি কাজ দেয়।

২০. বিছানায় প্রস্রাব: অনেক বাচ্চার নির্দিষ্ট বয়স পরেও এটি দেখা যায়। সিমা, মেডোরিনাম ব্যাসিলিনাম খুব ভালো কাজ দেয়।

## নারীদের জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

২১. ডিসমেনোরিয়া: মেনস্ট্রুয়েশনের সময় সাধারণত তলপেটে, কোমরে টেনে ধরা ব্যথা হয়। ব্যথা গরমে এবং চাপে কম হলে ম্যাগ ফস ২০০ নিতে পারেন। না হলে জ্যাম্বোজাইলাম ৬ নিতে পারেন।

২২. মেনোরেজিয়া: অতিরিক্ত ব্লিডিং হলে তাকে মেনোরেজিয়া বলে। জরায়ুর টিউমার, এন্ডোমেট্রেওসিস, অ্যাডিনোমায়োসিস পিআইডি ইত্যাদি কারণে অতিরিক্ত ব্লিডিং হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ব্লিডিং কমানোর জন্য চায়না ৬ দিতে পারেন।

২৩. অলিগোমেনোরিয়া বা অনিয়মিত মেনস্ট্রুয়েশন: এক্ষেত্রে মেনস্ট্রুয়েশন অনিয়মিত হয় এবং ৩৫ দিন বা তার অধিক দিনের ব্যবধানে হয়। প্রাথমিকভাবে অশোকা মাদার খেতে পারেন।

২৪. পিআইডি (পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ): এই অসুখে এন্ডোমেট্রিয়াম ফ্যালোপিয়ান টিউব, ওভারি ও আশপাশের অঙ্গগুলি সাধারণত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। ফলে তলপেটে ব্যথা, জ্বর, ইউরিনে জ্বালা ইত্যাদি হয়। ক্রিয়োজোট ২০০ দিনে ২ বার করে খান।

২৫. এন্ডোমেট্রিওসিস: এই অসুখের লক্ষণগুলি হল মেনস্ট্রুয়েশনের সময় অসহ্য ব্যথা, অতিরিক্ত ব্লিডিং এমনকী ইনফার্টিনিটিও হতে পারে। জ্যাম্বোজাইলাম ৩০ ব্যবহার করুন।

২৬. ইউটেরাসে টিউমার (ফাইব্রয়েড)

জরায়ুতে এটি হয়। লক্ষণগুলি হল অতিরিক্ত ব্লিডিং তলপেটে ব্যথা। ফ্র্যাক্সিনাস আমেরিকানা মাদার খেতে পারেন।

২৭. ওভারিয়ান টিউমার: ওভারির মধ্যে ছোট বেলুনের মতো ফুলে যায়। বিভিন্ন ধরনের সিস্ট যেমন ফলিকউলার সিস্ট, চকোলেট সিস্ট ইত্যাদি হয়। প্রাথমিকভাবে কোনিয়াম ম্যাক ৬ খেতে পারেন।

২৮. পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম: বর্তমানে নারীদের মধ্যে এই রোগটি খুবই বেশি দেখা যায়। লক্ষণগুলি হল অনিয়মিত মেনস্ট্রুয়েশন, মুখে ব্রণ, গোঁফ, দাড়ি দেখা যায়। এবং শরীরের বিভিন্ন খাঁজে কালো দাগ থাকে, যা অ্যাকান্থসিস নিগ্রিকানস নামে পরিচিত। প্রাথমিকভাবে এপিস মেল ৬ নিতে পারেন।

২৯. লিউকোরিয়া: এই রোগে ক্যানডিডা অ্যালব ২০০ নিতে পারেন।

৩০. ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা মূত্রনালীর সংক্রমণ: সাধারণত ই-কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া এর জন্য দায়ী। প্রস্রাবে জ্বালা, বারবার প্রস্রাবের বেগ, পেটে খিঁচ ধরা ব্যথা, সঙ্গে জ্বরও আসে। এমন লক্ষণ দেখা দিলে ক্যান্থারিস ৩০ বারবার খেলে হবে।।

৩১. গর্ভপাত: অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে বারবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্যাবরশন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভালো কাজ দেয়।

## গর্ভাবস্থার পরবর্তী সময়

৩২. মর্নিং সিকনেস: গর্ভাবস্থায় বমি হলে নিম্পোরিকার্পাশ ৩০ নিন।

৩৩. অ্যাসিডিটি: ন্যাট ফস ৬x।

৩৪. **জ্বর**: ফেরু ফস ৬x।
৩৫. **কোমরে ব্যথা**: ক্যালি কার্ব ৩০।
৩৬. **অর্শ**: গর্ভাবস্থায় অর্শের কষ্ট হলে কলিনসনিয়া ৩০।
৩৭. **মানসিক অবসাদ**: অ্যাকটিয়া রেসিমোসা ৬ নিন।
৩৮. **মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ কমলে**: অনেক সময় মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ কম হয়। তেমন হলে রিসিনাস ৬ নিন।
৩৯. **ইনফার্টিলিটি**: বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী খুবই ভালো কাজ দেয়। ফলিকুলিনাম ৩০ ওষুধটি।
৪০. **ব্রেস্টের সমস্যা**: ফাইব্রো অ্যাডিনোসিস— ব্রেস্টের মধ্যে ছোট ছোট তরলপূর্ণ সিস্ট থাকে।

কোনিয়াম ম্যাক ৩০ নিতে পারেন। ফাইব্রো অ্যাডিনোমা— এটি শক্ত মাংসের দলার মতো ব্রেস্টের মধ্যে থাকে। ফাইটোলক্কা ২০০ নিন।

৪১. **গ্যালভেটোরিয়া**: ল্যাকটেটিক মা ছাড়া অনেক সময় প্রোল্যাকটিন হরমোন বেশি হলে মিল্ক লিকেশন হয়। অ্যাসাফোয়েডিটা ৩০ নিন।
৪২. **মাথা ব্যথায় হোমিওপ্যাথি**: আমাদের কাছে মাথা ব্যথা নিয়ে যাঁরা আসেন বেশিরভাগ মাইগ্রেনের সমস্যা নিয়ে আসেন। আর মাইগ্রেন কাবু হয় হোমিওপ্যাথিতে। এই রোগে মাথার এক দিকে ব্যথা, বমি ভাব ইত্যাদি থাকতে পারে। রোগী বিশেষে ট্রিগার ফাক্টর বিভিন্ন হতে পারে। মাইগ্রেনকে কাবু করার কাজে কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধের জুড়ি মেলা ভার। সাধারণভাবে ডানদিকে ব্যথা হলে সাঙ্গুনেরিয়া ক্যান এবং বাঁ দিকে ব্যথা হলে স্পাইজেলিয়া খান।

## নাক, কান গলার সমস্যা

৪৩. **ল্যারিঞ্জাইটিস**: কোনও কারণে ল্যারিংসে প্রদাহ হলে তাকে ল্যারিঞ্জাইটিস বলে। খুসখুসে কাশি গলায় অস্বস্তি কথা বলতে কষ্ট, গলা শুকিয়ে যাওয়া এর লক্ষণ। প্রাথমিকভাবে কস্টিকাম ৩০ নিতে পারেন।
৪৪. **টনসিলাইটিস**: মজার বিষয় হল এরা শরীরকে ইনফেকশন থেকে বাঁচায় কিন্তু নিজেই যখন কোনও ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এই সমস্যাকে টনসিলাইটিস বলি। গলা ব্যথা, জ্বর, খাবার গিলতে অসুবিধা, কানে যন্ত্রণা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি হয়। প্রাথমিকভাবে স্ট্রেপটোকক্সিন ২০০ নিন।
৪৫. **ভোকাল কর্ড নডিউল এবং পলিপও সিস্ট**: ভোকাল কর্ডে মাংসের দলার মতো জমা হয়। যাঁরা জীবিকার জন্য বেশি কথা বলেন তাঁদেরই বেশি দেখা যায়। লক্ষণগুলি হল স্বর ভঙ্গ, হাল্কা ব্যথা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্জারি ছাড়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সারানো সম্ভব। কস্টিকাম ৩০ ভালো কাজ দেয়।
৪৬. **নাক বন্ধ**: এটি ছোট থেকে বড় সকলেরই সাধারণ সমস্যা, তবে এটি কখনও কখনও জটিল রোগের কারণ হতে পারে। অ্যামন কার্ব ৩০ ভালো কাজ দেয়।
৪৭. **সাইনুসাইটিস**: মাথা ভার অসহ্য মাথার যন্ত্রণা যা সূর্যের আলোর সঙ্গে বাড়ে আবার সন্ধ্যায় কমে যায়। হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ার মতো সমস্যা হয়। প্রাথমিকভাবে ক্যালিবাই ৩০ নিতে পারেন।
৪৮. **নাকের অ্যালার্জি**: ডাক্তারি ভাষায় এটিকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলি। অনবরত হাঁচি, চোখ লাল, জল পড়া, মাথা ভার, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। আপৎকালীন হিসাবে হিস্টামিন ৩০ নিতে পারেন।
৪৯. **নাকে পলিপ**: পলিপ হল বেলুনের মতো সাদা মাংসের মতো গ্রোথ নাক বন্ধ মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া, নাকের গন্ধ চলে যাওয়া, নাক ডাকা এর লক্ষণ। চিকিৎসা করালে বেশিরভাগ পলিপ চলে যায়। টিএমভি ২০০ নিতে পারেন।
৫০. **কানে পুঁজ**: মধ্য কানে সংক্রমণ হলে কান দিয়ে জল পড়া বা পুঁজ বেরয়। সাধারণভাবে আমরা বলি কানের পর্দা ফুটো হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে মার্কডালসিস ৩০ খুবই কার্যকরী।
৫১. **মাথা ঘোরা বা ভার্টিগো**: আপনার শরীরের সব কিছু স্বাভাবিক অথচ শরীরের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরছে। এটাকে বিনাইন প্যারক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো বলা হয়। এটি কান থেকে হয়। সাময়িকভাবে কোনিয়াম ৩০ নিন।
৫২. **টিনিটাস**: এই রোগে শুধুমাত্র রোগী কানে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ বা বাঁশির আওয়াজ পান। সঙ্গে যদি মাথা ঘোরা থাকে তাহলে সেটিকে আমরা মিনিয়ার্স ডিজিজ বলি। প্রাথমিকভাবে ন্যাট্রাম স্যালিসাইপ্লিকাস ২০০ নিতে পারেন।

## সুগার ও থাইরয়েডে হোমিওপ্যাথি

থাইরয়েডের রোগ যে কারও হতে পারে সে মহিলা পুরুষ, শিশু কিশোর এবং বয়স্ক। এটি দু'ধরনের— হাইপোথাইরয়েডিজম ও হাইপার থাইরয়েডিজম। হাইপার থাইরয়েডিজমের লক্ষণগুলি হল, উদ্বেগ, বিরক্তি ও নার্ভাসনেস, ঘুমের সমস্যা, ওজন কমে যাওয়া, গলগণ্ড,

পেশির দুর্বলতা ও কম্পন, অনিয়মিত মেনস্ট্রুয়েশন।
৫৩. **হাইপোথাইরয়েডিজম**: এর লক্ষণ— ক্লান্তি বোধ, ওজন বৃদ্ধি, বিস্মৃতির অভিজ্ঞতা, ঘন ঘন এবং মেনস্ট্রুয়েশন বেশি হওয়া, শুষ্ক ও রুক্ষ চুল, ভয়েস চেঞ্জ।

**চিকিৎসা**: ওষুধের সংখ্যা প্রচুর। এর মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য হাইরোডিনা ৩X কাজ দেয়।
৫৪. **হাইপার থাইরয়েডিজম**: এই রোগের জন্য Iodun ৩xp নিতে পারেন।
৫৫. **সুগার**: ব্লাড সুগারের মতো জটিল একটি অসুখকে বশে না রাখতে পারলে কিডনি, হার্ট, চোখ এবং স্নায়ু সহ দেহের একাধিক অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে হোমিওপ্যাথি অত্যন্ত কার্যকরী। কোনও রোগীর সুগার ধরা পড়ার প্রথম থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে উপকার সব থেকে বেশি। সিজিজিয়াম মাদার প্রাথমিকভাবে খেতে পারেন।
৫৬. **শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, সিওপিডি**: অ্যাজমা বা হাঁপানির প্রকোপে সারা বছর অনেকেই কষ্ট পান। অ্যাজমাতে শ্বাসকষ্ট হয়, তবে শ্বাসকষ্ট থাকলেই তা অ্যাজমা নয়। শরীর ও মনের নানা সমস্যা যেমন— ডিহাইড্রেশন, হার্টের অসুখ, সিওপিডি,

ক্লস্ট্রোফোবিয়াতেও শ্বাসকষ্ট হয়। ব্রঙ্কিওল অ্যাজমা রোগে রোগীর মনে হয় দম নিতে পারছেন না, বুকে সাঁই সাঁই বাঁশির আওয়াজের সঙ্গে বুকে কফ জমে থাকা ও কাশি থাকে। অ্যাজমা মূলত দুই রকমের, ১) অ্যাকিউট অ্যাজমা ও ২) ক্রনিক অ্যাজমা। ক্রনিক অ্যাজমা দীর্ঘমেয়াদি রোগ। আর এক ধরনের হাঁপানিও আছে যেটি অ্যালার্জিজনিত। রোগ লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সেরে যায়। আপৎকালীন হিসেবে ক্যাসিয়া সোফেরা মাদার ব্যবহার করতে পারেন।

## অন্যান্য ফুসফুসের অসুখ

**৫৭. সিওপিডি:** ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ আজকাল ফুসফুসের একটি প্রচলিত অসুখ। বায়ুথলির অস্বাভাবিকতার কারণে রোগীর শ্বাসপ্রক্রিয়া বাধা পায়, কাশি। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মাও থাকে বুকের মধ্যে। তাই সাঁইসাঁই শব্দ, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি দেখা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে অন্টিম আর্স নিতে পারেন।

পেটের অসুখে ভোগেন না এমন মানুষ কম আছেন। তাই পেটের রোগ থেকে বাঁচতে মুড়ি-মুড়কির মতো ওষুধ খাই, যা খুবই ক্ষতিকারক।

**৫৮. বদহজম বা ডিসপেপসিয়া:** হজমের গণ্ডগোল বা বদহজম, মূলত পেটব্যথা, অনেকের পেট ফুলে যায়। খাওয়ার পর ঢেঁকুর ওঠে, বমি ভাব, সাধারণত মশলাযুক্ত খাবার খেলে বদহজম হলে নাক্সভম ৩০, ঢেকুর উঠলে আরাম বোধ করলে কার্বভেজ ৩০ খান।

**৫৯. গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্ল্যাক্স ডিজিজ বা GERD:** এই রোগকে চলতি কথায় অম্বল বা অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্স বলে থাকি। এই রোগে খাওয়ার পরে বুকে জ্বালা, বুকে ব্যথা, মুখ দিয়ে টক জল উঠে আসা, গলায় দলা দলাভাব এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশিও থাকতে পারে। গলায় জ্বালাজ্বালা ভাব থাকলে প্রাথমিকভাবে অ্যাসাডিটি, বুক জ্বালা ও টক বমি হলে আইবিশ ভার্স ৬ খেতে পারেন।

**৬০. ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা IBS:** এটি আমাদের দেশে খুবই পরিচিত নাম, লক্ষণগুলি হল তলপেটে ব্যথা, খাওয়ার পর অস্বস্তি, পেটে গ্যাস হওয়া ও পেট ফুলে যাওয়া, বারবার পায়খানার বেগ বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতে পারে।

অব্যর্থ ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে, প্রাথমিকভাবে ডিসকম্পান্ড ভালো কাজ দেয়।

**৬১. গ্যাসট্রিক আলসার:** এর অর্থ হল পাকস্থলী, খাদ্যনালী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে ঘা হওয়ার সমস্যা।

**লক্ষণ-** পেটে ব্যথা, বিশেষ করে পাঁজরের নীচে, গভীর রাতে ব্যথার কারণে ঘুম ভেঙে যায়, খিদে পেলেই পেটে যন্ত্রণা। সঠিক চিকিৎসা করলে এই রোগ বেড়ে যায়, খাওয়ার পর ব্যথা করলে অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০ এবং খেলে ব্যথা হলে নাক্স ভোমিকা ৩০ নিন।

**৬২. জন্ডিস:** কোনও কারণে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে জন্ডিস বলে।

**লক্ষণ-** শুরুতে বমিভাব, খিদের অভাব সামান্য জ্বর দুর্বলতা হাত পা চুলকানো, চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া, ইউরিন হলুদ হয় এবং সারা শরীরে হলুদভাব ছড়িয়ে পরে। চেলিডোনিয়াম মাদার ভালো কাজ দেয়।

**৬৩. ফ্যাটি লিভার:** বর্তমান পরিস্থিতিতে এই রোগ অনেকের দেখা যায়। কোনও শারীরিক পরিশ্রম না করায় বেশিরভাগ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত এটি দু'ধরনের অ্যালকোহলিক এবং নন অ্যালকোহলিক। চেলিডোনিয়াম মাদার খুবই কার্যকরী।

**৬৪. গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর:** পেটের ডানদিকে হঠাৎ ব্যথা, পিত্তবমি, বমিভাব জ্বরও আসতে পারে। সব স্টোন হোমিওপ্যাথিতে যায় না নির্ভর করে সংখ্যা, সাইজ এবং প্রকারভেদের ওপর। প্রাথমিকভাবে কার্ডুয়াস মাদার খান।

**৬৫. টাইফয়েড:** রাস্তার অপরিষ্কার জল, শরবত, ঠান্ডা পানীয় কাটা ফল ইত্যাদি থেকে এই রোগ ছড়ায়।

টাইফয়েডিনাম এবং ব্যাপটিসিয়া ইত্যাদি ওষুধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে।

**৬৬. কোষ্ঠকাঠিন্য:** কিছু লোক দীর্ঘস্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে, বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবারই হতে পারে।

সঠিক চিকিৎসা করালে সেরে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্যাসকারা স্যাগ মাদার ব্যবহার করা যেতে পারে।

**৬৭. পাইলস বা অর্শ:** মলদ্বারের চারপাশ ফুলে যাওয়া, মলদ্বারে ব্যথা, চুলকানি ও রক্ত পড়া। সঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে অবশ্যই সারবে। প্রাথমিকভাবে নাক্স ভোম ৩০ নিন।

**৬৮. ফিসার:** মলদ্বারের আবরণ কেটে যাওয়াকে ফিসার বলা হয়। মলত্যাগের সময় ব্যথা এবং এই ব্যথা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সঙ্গে রক্তও বের হয়। ব্যথা কমানোর জন্য র‍্যাটেনহিয়া ৬ নিতে পারেন।

## ত্বকের অসুখে হোমিওপ্যাথি

সুন্দর ও স্বাভাবিক ত্বক শরীর ও মন উভয়ই ভালো রাখে। ত্বক সুস্থ না থাকলে শুরু হয় নানা মানসিক উদ্বেগ।

**৬৯. একজিমা:** এটি একটি ক্রনিক চর্মরোগ। এই অসুখে ত্বকের মধ্যে খুব চুলকানি এবং আক্রান্ত স্থান শুকনো হয়ে ফেটে গিয়ে লাল হয়ে ওঠে। এটি বিভিন্নরকম হয়।

**৭০. অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস:** প্রায়ই বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের অ্যালার্জির কারণে হয়ে থাকে।

**৭১. কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস:** প্রতিদিন বাসনমাজা, সব্জি কাটা, কাপড় কাচার মতো কাজ করলে এই রোগ হয়।

**৭২. জেরোসিস একজিমা:** এটি শুষ্ক আবহাওয়াতে দেখা যায়। বিশেষ করে শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটতে শুরু করে।

**৭৩. সেবোরিক ডার্মাটাইটিস:** এটিতে খুশকির থেকেও মোটা মামড়ি ওঠে। মাথার ত্বক, ভ্রু এবং মুখের থেকে মামড়ি ওঠে। একজিমা সারে হোমিওপ্যাথিতে। সালফার সোরিনাম, টরুলা ভালো কাজ দেয়।

**৭৪. দাদ বা রিং ওয়ার্ম:** এটি ছত্রাকজনিত রোগ এবং এটি রিং এর আকার ধারণ করে। তাই এটির নাম রিং ওয়ার্ম। ত্বকের উপর তামাটে গোলাকার ফোস্কার মতো দেখা যায়। রোগটি একের থেকে অন্যের দেহে ছড়াতে পারে।

দাদ হলে বলা হয় অন্য ওষুধ বারবার হোমিও ওষুধ একবার। ব্যাসিলিনাম, টেলুরিয়াম ইত্যাদি খুব ভালো কাজ দেয়।

**৭৫. স্কেবিস:** এটি একটি আদি চর্মরোগ, এই রোগের শুরুতে হাত ও আঙুলের মাঝে ছোট ছোট জলপূর্ণ ফুসকুড়ি ওঠে এবং অসম্ভব চুলকানি হয়।

প্রাথমিকভাবে সালফার ৬ ভালো কাজ দেয়।

**৭৬. হাজা:** এটি একটি ছত্রাকঘটিত রোগ। যাঁরা জলের মধ্যে দীর্ঘসময় কাজ করেন তাঁদের হাতে ও পায়ের আঙুলের মাঝখানে সাদা ঘায়ের মতো ফুলে ওঠে। ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস ২০০ ভালো কাজ দেয়।

**৭৭. সোরিওসিস:** জটিল চর্মরোগের মধ্যে এটি অন্যতম। রোগের শুরুতে আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে যায় এবং পরে গুঁড়ি গুঁড়ি রুপোলি রঙের চামড়ার খোসা ওঠে। এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ এবং সাইকোসোমাটিক অসুখ হিসাবে ধরা হয়। মানসিক আঘাত, স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা মানসিক উদ্বেগ এই অসুখের ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। ইগনেশিয়া, স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ইত্যাদি ওষুধ ভালো কাজ দেয়।

**৭৮. অ্যাকনে বা ব্রণ:** বয়ঃসন্ধিকালে শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখে দেখা যায় তবে পিঠে, বুকে প্রভৃতি জায়গায়ও দেখা যায়, ক্যালি ব্রম ২০০ ভালো কাজ দেয়।

**৭৯. আমবাত:** আমাদের দেহের বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ অ্যালার্জি জনিত কারণে ত্বকের মধ্যে চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে একে আমরা আমবাত বলি। ঠান্ডা দিলে আরাম হলে এপিস ৩০ এবং সামুদ্রিক মাছ কাঁকড়া প্রভৃতি থেকে হলে আর্টিকা ইউরেনস ৩০ খান।

**৮০. খুশকি:** মাথার মৃতকোষগুলি মামড়ি আকারে ঝড়তে থাকে, শুষ্ক আবহাওয়ায়ে বেশি দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে কচলেরিয়া মাদার ওষুধটি মাথায় লাগাতে পারেন।

**৮১. ভিটিলিগো বা শ্বেতী:** এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ। মেলানোসাইট কোষ থেকে মেলানিন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের ত্বক সাদা হয়ে যায়। নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এই রোগ সারানো যায়। থুজা, সালফার, মার্কসল ইত্যাদি খুব ভালো কাজ দেয়।

**৮২. আঁচিল:** হোমিওপ্যাথির নিন্দুকেরাও মানেন, একমাত্র আঁচিলের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে হয়। যে কোনও ধরনের আঁচিল সারবে হোমিওপ্যাথিতে।

**৮৩. হারপিস:** এটি হারপিস ভাইরাস জনিত কারণে হয় আক্রান্ত স্থান ফোস্কার মতো ফুলে ওঠে এবং খুব জ্বালা এবং যন্ত্রণা হয়। কিন্তু এই রোগ সেরে যাওয়ার পরও জ্বালা যন্ত্রণা থেকে যায়, প্রাথমিকভাবে হারপিস ৩০ ব্যবহার করুন এবং যদি জ্বালা যন্ত্রণা থেকে থাকে তাহলে মেজেরিয়াম ২০০ ব্যবহার করুন।

**৮৪. বাতের ব্যথা:** বাত বলতে নির্দিষ্ট কোনও অসুখকে বোঝায় না। তবে চলতি কথায় রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে বুড়ো আঙুল ফুলে লাল হয়ে যায়। হাঁটু ও অন্যান্য গাঁটে ব্যথার সমস্যা হয়। এটিকে গেঁটে বাত বা গাউট বলি। এক্ষেত্রে আর্টিকা ইউরেনস মাদার ভালো কাজ দেয়।

**৮৫. অস্টিওআর্থ্রাইটিস:** বয়সকালে শরীরের ওজন বহনকারী জয়েন্টগুলোতে ব্যথা দেখা দেয়। তবে পেশাগত বা অতিরিক্ত ওজনের জন্য মধ্যবয়সিদেরও মধ্যেও ইদানীং কালে এই রোগ দেখা যাচ্ছে। এক্স রে করলে দু'টি হাড়ের মধ্যবর্তী জয়েন্টে ক্ষয়ের ছবি পাওয়া যায়। যদি বিশ্রামে ভালো থাকেন তাহলে ব্রায়োনিয়া এবং হাঁটা চলা করলে ভালো থাকেন তাহলে রাসটক্স নিন।

**৮৬. রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস:** এক ধরনের অটোইমিউন ডিজিজ। এই অসুখে শরীরের বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ফোলা ব্যথা এবং লাল ভাব। সঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে অবশ্যই উপকার পাবেন।

**৮৭. ফাইব্রোমায়ালজিয়া:** সারা শরীরে ব্যথা। বিশেষ করে ঘাড়, বুক, হাতে ব্যথা কিন্তু টেস্ট করে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন কষ্ট পাচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে সারকোল্যাটিক ২০০ ব্যবহার করুন।

**৮৮. অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস:** এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ। সাধারণত কোমর, ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের জয়েন্টগুলিকে আক্রমণ করে। সাঁতারের সঙ্গে সঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে ভালো ফল পাবেন।

**৮৯. সার্ভাইক্যাল এবং লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস:** পেশাগত, কেউ কমবয়সে ভারী ব্যাগ, মোবাইল, ল্যাপটপ ব্যবহার সহ বিভিন্ন কারণে এখন এই রোগটি খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সঠিক ব্যায়াম এবং সঠিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করালে একদম সারে।

ক্যাকন্যানথিস ৩০ উপশমের জন্য নিতে পারেন।

**৯০. ফ্রোজেন শোল্ডার:** ফ্রোজেন শোল্ডার অসুখটি শুরু হয় কাঁধে ব্যথা দিয়ে। এরপর কাঁধ ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়। একসময় হাত নাড়ানোই অসম্ভব হয়ে যায়। ফ্রোজেন শোল্ডার সারে হোমিওপ্যাথিতে। প্রাথমিকভাবে ফেরাম মেট ২০০ খেতে পারেন।

**৯১. গোড়ালির হাড় বাড়া বা ক্যালকেনিয়াল স্পার:** গোড়ালিতে একটি ছোট হাড় বেড়ে যায়। সঠিক জুতো না পরলে বা অতিরিক্ত গোড়ালিতে চাপ পড়লে এটি হয়।

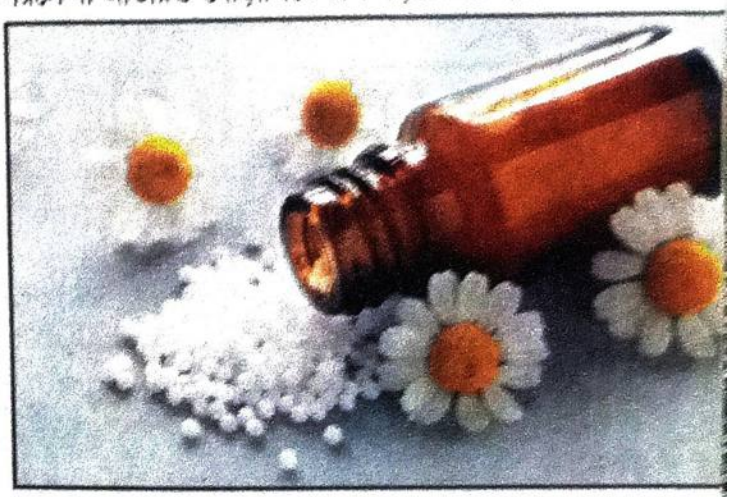



হোমিওপ্যাথিতে অব্যর্থ দাওয়াই আছে। গরম সেঁক দিয়ে আরাম পেলে ম্যাগফস এবং ঠান্ডা সেঁক দিয়ে আরাম হলে লিডাম পল নিন।

## কিডনির অসুখ

**৯২. ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা CKD:** কিডনির কাজ হল শরীরে ময়লা বাইরে বের করে দেওয়া। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, রক্তচাপ এবং বিভিন্ন মেডিসিনের কারণে কিডনি কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

রোগ যদি একেবারে শুরুর দিকে থাকে তাহলে হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এ্যালসেরাস 7x ওষুধটি খুব ভালো কাজ দেয়।

**৯৩. কিডনি স্টোন:** নির্দিষ্ট আকারের কিডনি স্টোন হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে চলে যায়। লক্ষণগুলো হল ব্যথা, জ্বর, বমি কিছু ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হয়।

প্রাথমিকভাবে বারবারিস ভালগারিস মাদার খুবই উপকারী।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদাই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন। কারণ সব রোগের জন্য প্রচুর ওষুধ আছে যার কার্যক্ষমতা দারুণ। তাই ডাক্তারবাবুরা বুঝে ওষুধপত্র এবং তার সঠিক মাত্রা নির্বাচন করেন।

*লেখক: অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পিসিএমএইচ কলেজ ও হসপিটাল*

# বিভিন্ন রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

ডাঃ আবদুর রহমান
ডাঃ নবনীতা মহাকাল

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরম' অর্থাৎ আমাদের শরীর ব্যাধির মন্দির আর এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করাই হল আয়ুর্বেদের মূলমন্ত্র।

এটা দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

১. স্বস্থস্য স্বাস্থ্য রক্ষনম—অর্থাৎসুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং

২. 'আতুরস্য বিকার প্রশমনন চ'— অসুস্থের চিকিৎসা করা।

দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে চলেও এসেছে আমাদের সবার আকাঙ্ক্ষিত শীতকাল। সন্ধ্যার ঝিরঝিরে বাতাস সেই বার্তা ইতোমধ্যে দিতে শুরু করেছে। আপনি প্রস্তুতি নিয়েছেন তো?

খুসখুসে কাশি, নাক সরসর কিংবা ভোরের দিকে গলাব্যথা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে অনেকের। ঋতু পরিবর্তনের সময় এমন হবেই। তার ওপর শীত পড়লেই ত্বকের শুষ্কতা, মাথায় খুশকি, চুলপড়ার সমস্যা শুরু হয়ে যাবে। শীতের সময় অনেকেই আবার মানসিক অবসাদে ভোগেন। জ্বর, সর্দি, শরীর ব্যথা, বমিভাব, তাছাড়া বিভিন্ন রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, লিভারের সমস্যা, সন্ধিবাত ইত্যাদি তো লেগেই আছে।

আর রোগ মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষাতে বলি, চিকিৎসা দু'রকম ভাবে করতে হয়। প্রথমটি হল রোগ সারাতে ওষুধ প্রয়োগ ও দ্বিতীয়টি ওষুধ ছাড়াতে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া। আমরা জানি কিছু সাধারণ প্রতিকার আমাদের বিভিন্ন রোগে খুব কাজে লাগে। তাছাড়া আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে নগণ্য। তাই আজ এই প্রতিবেদনে কিছু খুব বেশি পরিচিত রোগ ও তার আয়ুর্বেদিক প্রতিকার ও ওষুধ সম্পর্কে জানব শুধুমাত্র সাধারণ ধারণার জন্য। এটি কখনওই চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প হতে পারে না। আসুন তাহলে জেনে নিই কিছু রোগ ও তার প্রতিকার ও প্রচলিত আয়ুর্বেদিক ওষুধ সম্পর্কে—

**৯৪. অস্থিওপোরোসিস:** আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের ঘনত্ব কমতে শুরু করে। এ কারণে হাঁটাচলা ও কাজ করতে সমস্যা হয়। ৩০ বছর বয়সের পর থেকে বেশিরভাগ মানুষের হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। হাড়ের দুর্বল হওয়া ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বাড়ায়। অস্থিওপোরোসিস হল একটি হাড়ের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সমস্যার শেষ থাকে না। আমাদের দেশের একটা বড় অংশের মানুষের হয়ে থাকে এই সমস্যা। অনেকেই এই অস্থিওপোরোসিস রোগটিকে আর্থ্রাইটিস ভেবে ভুল করেন। তবে এটা আর্থ্রাইটিস নয়, আর্থ্রাইটিস আলাদা রোগ। বরং এটা হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার অসুখ। অস্থিওপোরোসিস রোগটিতে হাড় ক্ষয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

**চিকিৎসা:** হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খাওয়া-দাওয়া মেনে চলা খুব জরুরি। মদ্যপান ও ধুমপান ছাড়তে হবে। এই দুই নেশা সমস্যা বাড়তে পারে। এছাড়া মাছ, ডিম, দুধ, মাংস খান। কারণ এই খাবারে রয়েছে ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম। এতে হাড়ের ক্ষয় রোধ করা যাবে। তাই এই বিষয়টি মাথায় রাখার চেষ্টা করুন।

**অস্থিওপোরোসিসে কিছু ব্যবহৃত আয়ুর্বেদিক ওষুধসমূহ**

লাক্ষাদি গুগুল /আভা গুগুল /হাড়জোড় ট্যাবলেট /শাল্লকী ট্যাবলেট /প্রবাল পিষ্টি / মুক্তা পিষ্টি /কোকিলাক্ষ কষায়

**৯৫. সন্ধি-বাত (অস্থিওআর্থ্রাইটিস)**

সন্ধিবাতের সমস্যা একটি অতি পরিচিত কষ্টকর অস্থি রোগ। আমাদের দেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ এই রোগে ভুগছেন। ৬০ বছরের উপরে ১৮ শতাংশ মহিলা ও ৯.৬ শতাংশ পুরুষ

হাড়ের ব্যথায় কাতর। বার্ধক্য জনিত ক্ষয়ের জন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। এই সন্ধিবাত রোগটিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামে অভিহিত করা হয়।

বেশি রাত জাগা, অত্যধিক হাঁটা, সারাক্ষণ একনাগাড়ে বসে থাকা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ঠান্ডা জলের ব্যবহার ও বেশিক্ষণ এসি-তে থাকা, মল-মূত্র ইত্যাদির বেগ ধারণ করা, বেশি ভার বহন করা, ভুলভাবে ব্যায়াম বা আসন করা ইত্যাদি কারণে বায়ু বৃদ্ধি পায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে, বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যই সকল রোগের কারণ। তাই এই প্রকুপিত বায়ু শরীরে কফ ও পিত্তের সাম্যতাকেও নষ্ট করে ও সঙ্গে সপ্তধাতু অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র বিকৃত করে এবং এই রোগ তৈরি হয়। বিশেষভাবে বড় ও মাঝারি ধরনের ভারবাহী অস্থি সন্ধিগুলোর ক্ষয় হয়। দীর্ঘদিনের অনিয়মের ফলে জানুসন্ধি (হাঁটু), গুল্ফসন্ধি (গোড়ালি), ত্রিক সন্ধি (উরু সন্ধি), অংসসন্ধি (কাঁধের সন্ধি), কনুই, মণিবন্ধ (কব্জির সন্ধি) ইত্যাদিতে অবস্থিত শ্লেষ্মাধরা কলা বা এক ধরনের পিচ্ছিল জেলি জাতীয় পদার্থ (সাইনোভিয়াল ফ্লুইড) শুকিয়ে যায়। এর ফলে ওই সমস্ত সন্ধির হাড়ের প্রান্তগুলি পারস্পরিক ঘর্ষণ হয় ও প্রদাহ সৃষ্টি করে। এর ফলস্বরূপ ফোলা ও বেদনা (ইনফ্লামেশন ও পেইন) হয়। সাধারণত মধ্যবয়সি মায়েদের বা যেকোনও বেশি বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই অস্থি ও সন্ধির ক্ষয় দেখা যায়। কারণ, এই সময় শরীরে ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদি কম শোষণ হয় এবং অস্থি ধাতুর পোষণ ঠিকমতো হয় না।

### চিকিৎসা

• আয়ুর্বেদের মূল চিকিৎসা যা নিদান পরিবর্জন নামে পরিচিত। জীবনশৈলীর পরিবর্তন যেমন অনাহার, রাতজাগা, শীতল বাতাস ও জলের উপযোগ করা, বেশি পরিশ্রম করা, অতিরিক্ত হাঁটা, মল-মূত্রের বেগ ধারণ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে।

• পরিমাণ মতো জল, শাক-সব্জি, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি এবং মরশুমি ফল খেতে হবে, যা শারীরিক ক্ষয়কে রোধ করতে পারে।

• শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

• অল্প একটু সর্ষের তেল বা তিল তেলে ৪-৫ কোয়া রসুনকে ফুটিয়ে সেই তেল আক্রান্ত সন্ধির ওপর হালকা মালিশ করে গরম একটু সেঁক দিলে আরাম মেলে। তাছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত কিছু তেল যেমন— মহানারায়ণ তেল, কর্পূরাদি তৈল, মহাবিষগর্ভ তেল ইত্যাদি একটু হালকা হাতে মালিশ ও তারপরে বাত নাশক কয়েকটি দ্রব্য যেমন —দশমূল, রাস্না, নিশিন্দা ইত্যাদি ফোটানো জলের গরম সেঁক দিলে উপকার পাওয়া যায়।

• শুঁট (শুকনো আদা) ফুটিয়ে চায়ের মতো করে খেলে বেদনা ও ফোলা উভয়ই কমে যাবে।

• আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় বেশ কিছু ওষুধ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল যোগরাজ গুগ্গুল, মহাযোগরাজ গুগ্গুল, বাতগজাঙ্কুশ রস, মহাবাত বিধ্বংস রস, বাত গজেন্দ্র সিংহ রস, দশমূল ক্বাথ, মহারাস্নাদি ক্বাথ ইত্যাদি।

### ৯৬. আম-বাত (রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস)

আমবাত রোগটি একটি অতি কষ্টদায়ক অস্থিসন্ধিগত রোগ। যা রোগীকে ক্রমশ কর্মহীন করে তোলে। অস্থি ও সন্ধির আকারকে বিকৃত করে দেয় ও রোগীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এই রোগটিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলে। যা এক ধরনের ইমিউনিটি সম্পর্কিত আর্থ্রাইটিস। ১৬ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগ দেখা যেতে পারে। সারা ভারতে প্রায় দেড় কোটির বেশি মানুষ এই রোগে ভুগছেন। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার প্রায় তিন গুণ বেশি। আধুনিক বিজ্ঞানে 'রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভ' বা 'অ্যান্টি সিসিপি পজিটিভ' রোগীদের এই রোগের আওতায় আনলে ও আয়ুর্বেদে সেরো পজিটিভ এবং সেরো নেগেটিভ এই দুই ধরনের আর্থ্রাইটিসের কারণ এবং লক্ষণ গত সাদৃশ্যতা বিচার করে আমবাত রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

### চিকিৎসা

• প্রথমেই রোগের যা কারণ বা নিদান তা পরিবর্জন করতেই হবে। যেমন গুরুপাক খাওয়া, দুগ্ধজাত খাবার, লাল মাংস বা রেড মিট, বড় মাছ, অতিরিক্ত তেল-ঝাল মশলাযুক্ত খাবার ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। সারাদিন এসিতে থাকা, রাতজাগা, অত্যধিক পরিশ্রম, অধিক ব্যায়াম, অসময়ে খাওয়া, অত্যধিক খাওয়া ইত্যাদিও বর্জন করতে হবে।

• শরীরের বিপাক শক্তি বাড়ানোর জন্য শুণ্ঠী চূর্ণ (শুকনো আদার চূর্ণ) জলে ফুটিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এতে ফোলা ও ব্যথায় আরাম মেলে।

• আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিছু ওষুধ যেমন— বৈশ্বানর চূর্ণ বা বৃহৎ বৈশ্বানর চূর্ণ গরম জল সহ খাওয়ানো যেতে পারে। বেশ কিছু ওষুধ যেমন— সিংহনাদ গুগ্গুল, শিগ্রু গুগ্গুল, পুনর্নবা গুগ্গুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

• বেশ কিছু রসৌষধি যেমন সমীরপণ্যগ রস, সূর্যপ্রভা গুলিকা, বাতগজাঙ্কুশ রস, বাতগজেন্দ্র সিংহ রস, আমবাতারি রস, মৃত্যুঞ্জয় রস ইত্যাদি ওষুধ মধু অনুপানে দেওয়া যায়।

• যেহেতু এই রোগ সহজে সারে না, তাই শোধন চিকিৎসা অর্থাৎ পঞ্চকর্ম চিকিৎসা খুব কার্যকর। যেমন, স্নেহন, স্বেদন, বিরেচন, বস্তি ইত্যাদি প্রক্রিয়া করানো হয়। বস্তি হল একটি পঞ্চকর্ম প্রক্রিয়া যাতে মলদ্বার দিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। বস্তি যেগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল নিরুহ বস্তি, ক্ষার বস্তি, বৈতরণ বস্তি ইত্যাদি। এই বস্তি চিকিৎসায় আমবাতে আশ্চর্যরকম ফল মেলে।

### ৯৭. বাতরক্ত (গাউটি আর্থ্রাইটিস)

বর্তমান জীবনযাত্রায় 'বাতরক্ত' নামে এই রোগে অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা ভোগেন, এই রোগটিকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'গাউট' বা 'গাউটি আর্থ্রাইটিস' বলে। এতে সাধারণত ছোট ছোট সন্ধিগুলি যেমন পা ও হাতের আঙুলের সন্ধি, কব্জি বা কনুইয়ের সন্ধি অথবা অন্যান্য অনেক সন্ধিতে লাল ভাব, ব্যথা, ফোলা, প্রদাহ দেখা যায়। বিশেষভাবে পায়ের বুড়ো আঙুলের সন্ধি প্রায়ই প্রথমে ফোলে ও ব্যথা অনুভূত হয়। আধুনিক মতে, রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা যদি বাড়ে বা পিউরিন মেটাবলিজম যদি মাত্রাতিরিক্ত হয় তাহলে এই সমস্যা দেখা যায়।

### চিকিৎসা

আয়ুর্বেদের চিকিৎসায় নিদান বা রোগের কারণগুলিকে বর্জন করা চিকিৎসার প্রথম কর্তব্য। তাই আহার সম্বন্ধীয় এবং জীবনশৈলী সম্পর্কিত কারণগুলি বলা আছে তা পরিবর্জন করতে হবে। বিভিন্ন চূর্ণ ওষুধ যেমন তেউড়ি চূর্ণ বা নিশোথ চূর্ণ, গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ, চোপচিন্যাদি চূর্ণ গরম জলে মিশিয়ে রোগীকে দেওয়া হয়। পাচন ও ক্বাথ ঔষধি হিসাবে হিসাবে

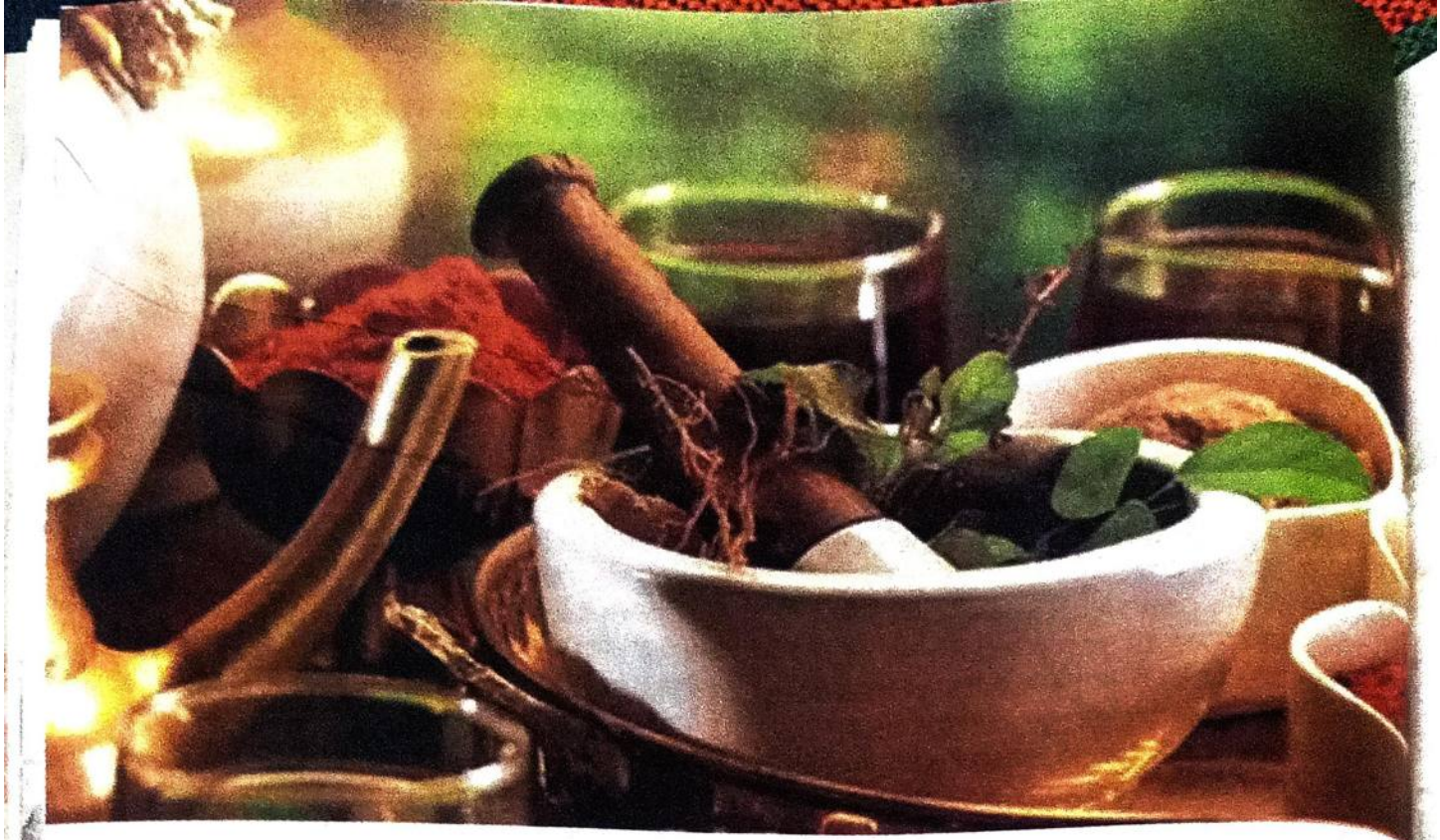

গুডুচ্যাদি ক্বাথ, পটোলাদি ক্বাথ, মহারাস্নাদি ক্বাথ, রাস্নাসপ্তক ক্বাথ, পুনর্নবাদি ক্বাথ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বটি ওষুধের মধ্যে কৈশোর গুগ্গুল, অমৃতাদি গুগ্গুল, শিগ্রু গুগ্গুল ইত্যাদি গরম জল সহ দেওয়া যায়।

এগুলি হল শমন ওষুধ, আরও ভালো ফল পেতে শোধন চিকিৎসা অর্থাৎ পঞ্চকর্ম চিকিৎসা করানো যেতে পারে।

**৯৮. গৃধ্রসী রোগ বা সায়াটিকা সিনড্রোম:**

আয়ুর্বেদে বর্ণিত বাতজব্যাধির মধ্যে গৃধ্রসী রোগ খুব বড় একটি সমস্যা, যেখানে কটি (কোমর), নিতম্ব, পায়ে প্রবল ব্যথা হয় এবং সেই ব্যথা গোড়ালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রোগী যন্ত্রণায় কাতর হন ও হাঁটা চলায় খুব কষ্ট হয়। এই অসুখের কারণে রোগী কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন।

**সায়াটিকার চিকিৎসা**

যেহেতু আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে রোগের কারণ বা নিদানকে বাদ দেওয়া প্রধান চিকিৎসা, তাই রোগ উৎপত্তির ক্ষেত্রে যে যে কারণগুলি বলা হয়েছে তার থেকে রোগীকে বিরত রাখাটাই চিকিৎসার প্রথম কাজ।

এই রোগের চিকিৎসায় কর্পূরাদি তেল, ক্ষীরবলা তেল, পিণ্ড তেল, মধ্যমনারায়ণ তেল, মহানারায়ণ তেল, মহামাষ তেল ব্যবহার করা হয় যা খুব উপকারী। এছাড়াও বলীয় রাস্নাদি কষায়, দশমূল ক্বাথ, রাস্না দশমূল ক্বাথ, অষ্টবর্গ কষায়, মুস্তাদি মর্ম কষায় ইত্যাদি গরম জল-সহ ব্যবহারে খুবই ভালো ফল মেলে। বেশকিছু গুগ্গুল ও রসৌষধি বটিও সায়াটিকার ব্যথায় অব্যর্থ যেমন— ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল, সিংহনাথ গুগ্গুল, যোগরাজ গুগ্গুল, রাস্নাদি গুগ্গুল, বাতগজাঙ্কুশ, বাতোগজেন্দ্র সিংহ রস ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদ মতে উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় বস্তি প্রয়োগ নিয়ম মতো করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

**৯৯. অববাহুক (ফ্রোজেন শোল্ডার):**

আয়ুর্বেদে উল্লেখিত অববাহুক রোগটিতে কাঁধের সন্ধি আড়ষ্ট ও শক্ত হয়ে যায় যাকে আধুনিক চিকিৎসা পরিভাষায় বলে 'ফ্রোজেন শোল্ডার'। অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে কিংবা বিশ্রাম অবস্থা থেকে নড়াচড়া করতে গেলে প্রবল ব্যথা অনুভূত হয় কাঁধের সন্ধিতে। মনে হয় যেন কোনওমতেই নাড়ানো যাচ্ছে না কাঁধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টির আর এক নাম 'অ্যাডেসিভ ক্যাপসুলাইটিস'। মূলত চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের এই রোগের ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যায় ভোগা রোগীর ক্ষেত্রেও এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। পুরুষের তুলনায় নারীর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি।

**চিকিৎসা**

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই রোগের জন্য বাতনাশক ওষুধ প্রয়োগ ও নানা ধরনের নস্য ব্যবহারের কথা উল্লেখিত আছে। এই রোগের চিকিৎসায় প্রসারণী কষায়, বলীয় রাস্নাদি কষায়, দশমূল ক্বাথ, রাস্না দশমূল ক্বাথ, অষ্টবর্গ কষায়, মুস্তাদি মর্ম কষায় ইত্যাদি গরম জল সহ ব্যবহারে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। বেশ কিছু গুগ্গুল ও রসৌষধি বটিও ফ্রোজেন শোল্ডারের ব্যথায় অব্যর্থ যেমন— বাতগজাঙ্কুশ, বাতোগজেন্দ্র সিংহ রস, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল, সিংহনাথ গুগ্গুল, যোগরাজ গুগ্গুল, রাস্নাদি গুগ্গুল ইত্যাদি। বৃহণ নস্যের জন্য— ক্ষীরবলা ১০১ ড্রপস, অণু তৈল, মহারাজ প্রসারণী তৈল অথবা বাদাম তেল ব্যবহার করা হয়। এই নস্য ব্যথা ও আড়ষ্ট ভাব কমাতে অব্যর্থ। এছাড়াও কাঁধের এক্সারসাইজ ও স্ট্রেচও খুব ফলপ্রসূ।

**১০০. প্রতিশ্যায় (রাইনাইটিস):**

প্রতিশ্যায় হল নাকের অতিপরিচিত রোগ। এই রোগে নাক থেকে অনবরত স্রাব বের হতে থাকে ও দীর্ঘদিন ভুগলে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করে যেমন— নাকে গন্ধ না পাওয়া, মাথা ব্যথা বা অনবরত হাঁচি ও নাক থেকে জল পড়তে থাকে।

**চিকিৎসা:** এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় লংঘণ অর্থাৎ উপবাস বা হালকা ভোজনে থাকতে হবে। এছাড়া স্টিম নেওয়া বা স্বেদন, দীপন-পাচন অর্থাৎ মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেওয়ার

মতো চিকিৎসা করতে হবে। রোগী ঈষদুষ্ণ জল পান করবেন ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করবেন। যেসব আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলি হল— ব্যোষাদি বটি, লক্ষ্মীবিলাস রস (নারদীয়), অগস্ত হরীতকী ও নস্য অর্থাৎ নাকের ড্রপ হিসাবে ষড়বিন্দু তৈল ও অণু তৈল ইত্যাদি।

**ক্ষবথু (সাইনুসাইটিস):**

এই রোগে আমাদের নাকের প্রকোষ্ঠ প্রায় বন্ধ থাকে ও সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা ও একটা ভারীভাব থাকে। আমাদের নাকের চারপাশে মুখমণ্ডলের হাড়ে চার জোড়া কুঠুরি থাকে। এগুলিকে সাইনাস বলে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস প্রভৃতির দ্বারা এর মধ্যে প্রদাহ হলে তাকে সাইনুসাইটিস বলে। এই রোগে বন্ধ নাকের সঙ্গে মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। আয়ুর্বেদে এই রোগের চিকিৎসা প্রতিশ্যায় রোগের অনুরূপ করা হয়।

**অর্ধাবভেদক বা মাইগ্রেন:**

আমরা দুই ধরনের মাইগ্রেন দেখতে পাই, প্রথমটি হল মাথা যন্ত্রণা শুরুর আগে একটি আলোর ঝলকানি দেখতে পাওয়া অর্থাৎ আভাযুক্ত মাইগ্রেন। দ্বিতীয়টি হল মেনস্ট্রুয়াল মাইগ্রেন অর্থাৎ মেনসট্রুয়েশনের আগে বা পরে আলোর ঝলকানি ছাড়া আভাহীন মাইগ্রেন। এই রোগটি এতটাই পরিচিত ও যন্ত্রণাদায়ক যে এর লক্ষণ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করা হয়। শুকনো আদা অর্থাৎ শুঁঠের নিত্য সেবন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁসের প্রয়োগ খুব ভালো কাজে দেয়। আয়ুর্বেদ ওষুধ যেমন শিরঃশূলাদি বজ্র রস, লক্ষ্মীবিলাস রস, সূর্যপ্রভা বটি ও অণুতৈল নস্য খুব কাজে দেয়।

**পাণ্ডু রোগ (অ্যানিমিয়া):**

চরক সংহিতা অনুসারে পাণ্ডু রোগের কারণ হল— ক্ষারীয় পদার্থ, অম্ল, লবণ, অত্যন্ত উষ্ণ, পরস্পর বিরোধী আহার, দিনে ঘুমানো, ঋতুর বিপরীত আহার, শারীরিক বেগ (তৃষ্ণা, হাঁচি, কাশি, নিদ্রা ইত্যাদি) রোধ করা ইত্যাদি। এছাড়াও অত্যধিক চিন্তা, ভয়, ক্রোধ, শোক ইত্যাদি বিবিধ মানসিক কারণে এই রোগ হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদে পাণ্ডু রোগ পাঁচ প্রকার। পাণ্ডু রোগের উপসর্গগুলি হল অগ্নিমান্দ্য, দুর্বলতা, অরুচি, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়, শারীরিক রুক্ষতা, পরিশ্রম ছাড়াই ক্লান্তি ভাব, কানে অবাঞ্ছিত শব্দ অনুভব করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

**চিকিৎসা**

• মধুর সঙ্গে যষ্টিমধু সেবন করলে পাণ্ডুরোগে হিতকারী।

• আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট গ্রন্থ ভৈষজ রত্নাবলীতে উল্লেখিত গুঁড়ো হরীতকী পাণ্ডু রোগের উত্তম যোগ। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এটি সেবন করা উচিত। এছাড়াও নবায়স চূর্ণ, একক দ্রব্যের মধ্যে আমলকী, ভৃঙ্গরাজ, ভূমি আমলকী, কুটকি, পুনর্নভা, গুলঞ্চ, হরিদ্রা ইত্যাদি যথেষ্ট ফলপ্রসূ। আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোগ ও রোগীর সাপেক্ষে পঞ্চকর্ম চিকিৎসা, কৃমিহর চিকিৎসা ও দোষের অবস্থা অনুযায়ী বিবিধপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। যে আয়ুর্বেদে ওষুধগুলি সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল— নবয়াস লৌহ, ধাত্রী লৌহ, লৌহ সিন্দুরম, লৌহাসব, দ্রাক্ষাসব, সুবর্ণমাক্ষিক ভস্ম উল্লেখ্যযোগ্য।

**মুখের ব্রণ বা যৌবন পিড়কা:**

হরমোনের তারতম্য, ধুলোবালি, ধোঁয়ার দূষণ, অনিয়মিত লাইফস্টাইল এবং ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণেই মুখের যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠে ব্রণ। আর ব্রণের ভিড়ে ঢাকা পড়ে ত্বকের জেল্লা।

• হলুদে রয়েছে অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। এর গুণেই ব্রণ থেকে রেহাই মিলবে দ্রুত। এর জন্য জল বা মধুর সঙ্গে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে মুখে মাখুন। ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিলেই চমকাবে ত্বক।

• নিমপাতাও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ব্রণ কমাতে। নিমপাতার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বিষয়ে সবাই জানেন। তাহলে এ দিয়েই দূর করুন ত্বকের ব্রণ। কয়েকটি নিমপাতা বেটে ব্রণে লাগিয়ে দিন। এর ছোঁয়াতেই ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হবে।

• চাইলে অ্যালোভেরা দিয়েও ব্রণ দূর করতে পারেন। বাড়িতে থাকা অ্যালোভেরা গাছের থেকে রস বের করে ত্বকে লাগান। এর অ্যান্টিইনফ্লামেটরি ধর্ম ব্রণের জ্বালাপোড়া ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এর ছোঁয়ায় মিলিয়ে যাবে ব্রণের দাগও।

• ব্রণ কমাতে সিদ্ধহস্ত চন্দনও। তাই চন্দনের পেস্ট বানিয়ে

ত্বকে লাগান। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন। তাতেই ব্রণ থেকে রেহাই মিলবে। ত্বকও হবে ঝলমলে।

• এ ছাড়া ত্রিফলাও ব্রণের চিকিৎসায় ভালো কাজে লাগে। আমলকী, বহেড়া ও হরীতকী নিয়ে তৈরি হয় ত্রিফলা। এর চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তারপর ব্রণতে লাগান। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ধর্ম ত্বকে ব্রণ-র দাপট কমাবে। এছাড়াও মহামঞ্জিষ্ঠাদি ক্বাথ, আরোগ্যবর্ধনী বটি ও কুমকুমাদি তৈল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের চিরাচরিত ওষুধ।

**লিভার বা যকৃতের সমস্যা:**

আমাদের শরীরের অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল লিভার বা যকৃৎ। অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা, নিম্নমানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পর্যাপ্ত পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার গ্রহণ না করা, ব্যায়াম না করা, অ্যালকোহল পান, অসময়ে খাদ্যগ্রহণ এবং দূষণের কারণে লিভারের সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রতিকার— মেথির দানা লিভারের সমস্যা দূর করতে সহায়ক। এক চামচ মেথির দানা রাতে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে উঠে খালি পেটে সেই জল পান করুন। মেথির দানা ফাইবার সমৃদ্ধ যা ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং

লিভার ও মেটাবলিজমের জন্য সহায়ক। রান্না ঘরে থাকা আরেকটি দুর্দান্ত মশলা হল লবঙ্গ।

এই লবঙ্গ লিভার সিরোসিসের উপসর্গগুলিকে হ্রাস করে এবং ফ্যাটি লিভারের সমস্যাকেও দূর করে। প্রতিদিন খাদ্যের সঙ্গে লবঙ্গ খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকারক র‍্যাডিকেলকেও দূর করতে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ ওষুধ যেগুলি ব্যবহার হয় সেগুলি হল— আরোগ্যবর্ধনী বটি, ভৃঙ্গারাজ চূর্ণ ও আসব, রোহিতকারিষ্ট, ফলাত্রিকাদি পাঁচন, যকৃৎপ্লীহারি লৌহ ইত্যাদি।

**কাশ রোগ বা কাশি:**

আয়ুর্বেদে কাশ রোগ ও কাশ লক্ষণ এই দুই ভাবে কাশিকে বিবেচনা করা হয়েছে। কাশ যখন স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় তখন সেটা কাশ রোগ। কিন্তু যখন অন্য রোগের লক্ষণ হিসাবে প্রতীয়মান হয় তখন শুধুই কাশ নামে পরিচিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে কাশ বা কাশি মূলত একটি লক্ষণ।

**ড্রাই কাফ:** এক্ষেত্রে শুধুমাত্র শুকনো কাশি থাকে। কোনওরকম কফ ওঠে না।

**প্রোডাক্টিভ কাফ:** কাশির সঙ্গে কফ জলের মতো বা থোকা থোকা ওঠে। একে ওয়েট কাফও বলা হয়ে থাকে।

**প্যারাক্সিসমাল কাফ:** অত্যন্ত বীভৎস কাশি। কিছুতেই রুখতে পারা যায় না। খুবই বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর কাশি।

**ক্রাউপ কাফ:** নাসারন্ধ্র থেকে শ্বাসযন্ত্র পর্যন্ত উর্ধ্বভাগের শ্বাসনালীতে জীবাণু সংক্রমণের কারণে শ্বাস প্রশ্বাস যাতায়াতের রাস্তায় অবরোধ তৈরি হয় এবং কাশি উৎপন্ন হয়। সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়।

**হুপিং কাফ:** এটি একটি ভাইরাসের সংক্রমণ। অত্যন্ত কষ্টকর কাশি হয়। এই কাশি প্রতিহত করার জন্য প্রতিষেধক টিকা নেওয়া যেতে পারে।

**স্মোকার্স কাফ:** এই নামকরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যাঁরা বিড়ি, সিগারেট খান তাঁদেরই এই ধরনের কাশি হয়। অত্যন্ত বিরক্তিকর এই কাশি যে কোনও সময় দেখা দিতে পারে।

**জেরিয়াট্রিক কাফ:** বার্ধক্যের জন্য রোগী যখন ঘন-ঘন কাশিতে আক্রান্ত হন, বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্রের ক্ষমতা যখন কমে যায় তখনই এই কাশি হয়। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ হিসাবে বয়স্ক মানুষেরা এই কাশিতে কাহিল হন।

**চিকিৎসা**

অন্যান্য রোগের মতো এই রোগের চিকিৎসাতেও প্রথমেই নিদান বা কারণকে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধুলো ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা, অতি পরিশ্রম করা, শুকনো, রুক্ষ, ঝাল খাবার খাওয়া, উপবাস করা ইত্যাদি যে নিদান তাকে পরিত্যাগ করতেই হবে।

**শুষ্ক কাশে:** তালিসাদি চূর্ণ ও শৃঙ্গাদি চূর্ণ সহযোগে দুই গ্রাম করে দিনে দুই থেকে তিনবার মধু-সহ চেটে খাওয়া যায়। চন্দ্রামৃত রস-২৫০ মিলিগ্রাম দিনে তিন বার মধুসহ চেটে খাওয়া যায়। কাশ কুঠার রস— ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে দুবার মধু-সহ খাওয়া যায়। লবঙ্গাদি বটি ও মরিচ্যাদি বটি ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার মধু সহ খাওয়া যায়।

**আর্দ্র কাশিতে:** সিতোপলাদি চূর্ণ দুই গ্রাম করে দিনে তিনবার মধু সহ চেটে খাওয়া যায়।

**লক্ষ্মীবিলাস রস:** ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার আদার রস দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায়।

**আর্দ্র বা শুষ্ক বা যে কোনও কাশিতে:** শ্বাসকাস চিন্তামণি রস—১২৫ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার মধু সহ খেতে দিতে হবে। দশমূলকটুত্রয়য়াদি ক্বাথ ২০ মিলি লিটার দিনে দু'বার সমপরিমাণে জল সহ খেতে হবে। অভ্র ভস্ম, প্রবাল ভস্ম ২৫০ মিলিগ্রাম করে দিনে দু'বার খাওয়া ভীষণ উপকারী। লঘুমালিনী রস ১২৫ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার মধু সহ উপকারী।

**শ্বাস রোগ বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিস:**

শ্বাস রোগে বিশেষ করে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিস অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্রনিক দুরারোগ্য ব্যাধি। পৃথিবী জুড়ে অ্যাজমা একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ অ্যাজমায় আক্রান্ত। পৃথিবীর যত মানুষ অ্যাজমাতে ভোগেন, তার সাড়ে ১৭ শতাংশ মানুষ ভারতে থাকেন। ইনহেলার, স্টেরয়েড, ব্রঙ্কোডায়োলেটর, অ্যালার্জিনাশক ওষুধ ইত্যাদির মাধ্যমে আপাতত রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘব করা গেলেও এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি কেউ পাচ্ছে না। তাই দেখে নেওয়া যাক এরকম একটি গুরুতর কষ্টদায়ক স্বাস্থ্য সমস্যায় আয়ুর্বেদ কীভাবে সাহায্য করতে পারে।

আয়ুর্বেদ মতে, কার্ডিও রেসপিরেটরি সিস্টেম বা শ্বাসরোগ প্রাণবহ স্রোতের অর্থাৎ হৃদয় ও শ্বাসনালীর একটি রোগ, এই সমস্যায় রোগীর শ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ছাড়ার প্রক্রিয়ায় অতীব কষ্ট অনুভূত হয়। সাঁ সাঁ শব্দ হয় বলে একে শ্বাসরোগ বলে। এই রোগে মূলত বায়ু ও কফ কুপিত হয়। এই কুপিত কফ দ্বারা বায়ু বিশেষ করে প্রশ্বাসবায়ু বা প্রাণবায়ুর যাতায়াতের রাস্তা যখন অবরুদ্ধ হয়, তখনই শ্বাসকষ্ট সহ অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

**চিকিৎসা**

অন্যান্য রোগের চিকিৎসার মতো এই তমক শ্বাস বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার চিকিৎসায় ও রোগীর নিদান বা কারণগুলিকে যেমন ধুলো, ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসা, শীতল পানীয়, গুরুপাক খাবার, দুপুরে ঘুম ইত্যাদি বায়ু ও কফ প্রকোপক যে নিদানগুলি আগে বলা হয়েছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। যেসব আয়ুর্বেদিক ওষুধ সচরাচর ব্যবহার হয়ে থাকে—

- **শীতপলাদি চূর্ণ:** ৩ গ্রাম মাত্রায় দু' বার মধু সহ খাওয়া যায়। সকালে ও সন্ধ্যায় খাওয়া যেতে পারে।
- **শৃঙ্গাদি চূর্ণ:** ৩ গ্রাম মাত্রায় দুপুরে ও রাতে খাবার পর গরম জল সহ খাওয়া যায়।
- **পিপুল চূর্ণ:** ১২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় পিপুল চূর্ণ নিয়ে প্রতিদিন মধু সহ চেটে খেলে শ্বাসকষ্ট সারে। এই সমস্ত ওষুধ

সংশমনীয় অর্থাৎ দোষকে সাম্যাবস্থায় আনতে সাহায্য করে।

• **শ্বাসকুঠার রস:** ১২৫ মিলিগ্রাম থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু' বার মধু সহ খাওয়া যায়।

• শঙ্খ ভস্ম, অভ্রক ভস্ম, টঙ্কন ভস্ম ইত্যাদি ২৫০ মিলিগ্রাম থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম খাওয়া যেতে পারে।

• দশমূল ক্বাথ, শিরিষ ক্বাথ, দেবদার্বাদি ক্বাথ, বাসাদি ক্বাথ ২০ মিলিলিটার দিনে দু' বার দেওয়া যেতে পারে। অত্যধিক শ্বাসকষ্টে এই ক্বাথগুলির যেকোনও একটির সঙ্গে সোমলতা চূর্ণ

৫০০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার প্রক্ষেপ দিয়ে খাওয়া যায়।

• বাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ, ইত্যাদি ৫ থেকে ১০ গ্রাম করে দু' বার চেটে চেটে খেতে হয়।

• দ্রাক্ষারিষ্ট, দ্রাক্ষাসব, কনকাসব ইত্যাদি ২০ মিলিলিটার দিনে দু'বার সমপরিমাণ জল সহ খাওয়া যায়।

**অম্লপিত্ত (হাইপার অ্যাসিডিটি):**

গ্যাস, অম্বল আমাদের রোজকার সমস্যা। এমনকী অনেকেই ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ খাওয়ার পরও গ্যাস, অ্যাসিডিটির খপ্পরে পড়েন। সাধারণত দু'টি কারণে গ্যাস, অ্যাসিডিটির ফাঁদে পড়তে হয়। প্রথমত, কোনও কারণে হজমরস বা জঠরাগ্নি ঠিক মতো তৈরি হয় না। ফলে খাবার হজম হতে চায় না। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক পরিমাণে জঠরাগ্নি তৈরি হয়। ফলে পাকস্থলীর লাইনিং বা অন্দরের দেওয়ালে ক্ষত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

**চিকিৎসা**

জঠরাগ্নি কম থাকলে জিরে, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, আমলকী সহযোগে তৈরি কিছু হজমি অত্যন্ত কার্যকরী। অপরদিকে পেটে বায়ু জমার প্রবণতা থাকলে পিপুল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ হল মহৌষধির সমান। আবার পাকস্থলীতে বেশি অ্যাসিড তৈরি হলে যষ্টীমধু, ত্রিফলা এবং আমলকী অত্যন্ত কার্যকরী। তাছাড়া ধাত্রী লৌহ, লবণভাস্কর চূর্ণ, অবিপত্তিকার চূর্ণ, চিত্রকাদি বটি ও মহাশঙ্খ বটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**কোষ্ঠকাঠিন্য**

একটি গুরুতর সমস্যা তবে লোকেরা এটিকে হালকাভাবে নেয়। শরীরে অস্বস্তি বোধ করা থেকে শুরু করে পেটে ব্যথার মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধান কারণ হল অনিয়মিত জীবনযাপন এবং দুর্বল খাদ্যাভ্যাস। এর সঠিক চিকিৎসা জরুরি। যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা না করা হয় তবে এটি পরবর্তীতে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পরিণত হতে পারে, যা অর্শ, বায়ু, অন্ত্র এবং পাকস্থলীর অনেক গুরুতর রোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

**চিকিৎসা:**

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে, তা থেকে মুক্তি পেতে গরম জল ও ঘি ব্যবহার করতে পারেন। ঘি আমাদের শরীরকে লুব্রিকেট করতে এবং অন্ত্র পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এটি বর্জ্য সঞ্চালন উন্নত করে ও কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি কমায়।

ঘি বিউটরিক অ্যাসিডের একটি বড় উৎস। বিউটরিক অ্যাসিড খাওয়া অন্ত্রের বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং মল চলাচলে সহায়তা করে। এছাড়া উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার খেতে হবে। যে ওষুধগুলি ব্যবহার হয় সেগুলি হল, ত্রিবৃত চূর্ণ ও অবলেহ, অবিপত্তিকার চূর্ণ, ত্রিফলা চূর্ণ, বিরেচন চূর্ণ ইত্যাদি। পরিশেষে বলতে চাই যেকোনও রোগে শুধুমাত্র ঔষধ সেবন ছাড়াও, খাদ্য খাবার ও জীবনশৈলীর পরিবর্তন করা খুব জরুরি।

# সুখে থাকুন

এ সপ্তাহে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষী **ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

• আমার নাতনি দিতিশা চক্রবর্তীর জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। তার লেখাপড়া, চাকরি ও ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে?
***নীলরতন চক্রবর্তী***
***লেকটাউন, শিলিগুড়ি***

•• আপনি নাতনির জন্মস্থান উল্লেখ করেননি। এই জন্যে তার জন্মকুণ্ডলী তৈরি করা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ তথ্য সহ আবার চিঠি লিখুন। নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া হবে।

•••

• পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। কর্মস্থান কেমন হবে? চাকরির যোগ আছে কি? কোন সময়ে চাকরি হবে? বিবাহিত জীবন কেমন হবে? শরীর স্বাস্থ্য কেমন থাকবে? অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে কি?
***নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক***
***হুগলি***

•• আপনি অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন, তার মধ্যে চারটির উত্তর দিচ্ছি। জাতকের সিংহ লগ্ন, মিথুন রাশি, আর্দ্রা নক্ষত্র, শূদ্র বর্ণ, নর গণ।

কর্মযোগ ভালো। কর্মসূত্রে বিদেশ গমনও অসম্ভব নয়। তবে কর্ম পরিবেশগত সমস্যা মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দেবে। সহকর্মী কিছু ক্ষেত্রে শত্রুতাও করতে পারে। বর্তমানে কর্মে বাধা থাকবে। এপ্রিল ২০২৫ থেকে তা একটু বাড়তে পারে। এপ্রিল ২০৩০ থেকে কর্ম শুভ। ওই সময় সুকর্ম প্রাপ্তিও হতে পারে। শরীর, স্বাস্থ্য কমবেশি ভালো থাকবে। বিবাহিত জীবন মোটামুটি। মানিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় সমস্যা বাড়বে। আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে। ২০৩০ থেকে ক্রমশ শক্তি বাড়বে।

•••

• জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। আমার চাকরি হবে কি? কবে ঋণমুক্ত হব? কন্যা সন্তানের লেখাপড়া কেমন হবে?
***তানিয়া ভট্টাচার্য***
***হাওড়া***

•• আপনার কন্যা লগ্ন, সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, শুক্লা প্রতিপদ তিথি, দেবারি গণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ বর্তমান সময় থেকে ডিসেম্বর ২০২৯ সাল পর্যন্ত সময়কাল গ্রহ বৈগুণ্যে অনুকূল নয়। প্রবল মানসিক অস্থিরতা ও পারিপার্শ্বিক চাপে মাঝেমধ্যে দিশেহারা হতে পারেন।

এপ্রিল ২০২৯ সালের পর ধীরে ধীরে ঋণের বোঝা কমবে এবং ঋণমুক্ত হবেন। আপনার জন্মকুণ্ডলী অনুসারে কন্যার লেখাপড়ায় আগামী তিনবছর পর্যন্ত বাধা একটু বেশি থাকবে। মানসিক অস্থিরতা ও সঠিক বিদ্যাচর্চার অভাবে পরীক্ষার ফল মনোমতো না-ও হতে পারে। আপনার কঠিন সময় থেকে মুক্তির জন্য যত পারেন 'দুর্গা ' নাম জপ করুন। আদিত্য হৃদয়ম স্তব পাঠ করুন। আর অবশ্যই ঋণমোচক মঙ্গলের স্তব পাঠ রোজ করুন।

•••

• আমার ভাগ্নির পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ জীবন ও চাকরির ব্যাপারে জানতে চাই। জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম।
***রঞ্জন দত্ত***
***হাওড়া***

•• জাতকের মিথুন লগ্ন, সিংহ রাশি, পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, নর গণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ। জাতিকার উচ্চশিক্ষার যোগ আছে। তবে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যায় বাধা একটু বেশি থাকবে। আগস্ট ২০২৮ পর্যন্ত চঞ্চলতার জন্য বিদ্যায় সঠিক মনোনিবেশের অভাব থাকবে।

সঠিক ফল লাভের ক্ষেত্রে বাধা থাকবে। পেশাগত কারিগরি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত শুভ। চাকরির থেকে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি জাতিকার পক্ষে বিশেষ শুভ।

•••

• মেয়ের জন্মবৃত্তান্ত পাঠালাম। বিবাহ কবে হবে? পাত্র কেমন হবে? বিবাহিত জীবন সুখের হবে কি?।
***তপতী গুহ***
***আনন্দ পালিত রোড,***
***কলকাতা-১৪***

•• আপনি চিঠিতে যে তথ্য পাঠিয়েছেন তা অসম্পূর্ণ। আপনি জন্ম সময় দিয়েছেন কিন্তু এএম বা পিএম জানাননি। ফলে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।
**যোগাযোগ: ৯৬৮১১১৮৪৪৪/৯০৫১১১২৮৯৪।**

• **এই বিভাগে পাঠানো চিঠিতে জন্মছক (যদি থাকে), জন্মসময়, জন্মতারিখ, জন্মস্থান ও ফোন নম্বর অবশ্যই পাঠাবেন।**

# আমি ও আমি

## আমরা আমাদের আমিটাকে নাড়াচাড়া করি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পর্ব ॥ ৪৮ ॥

জীবন হল এক প্যাকেট সময়। রোজ একটু একটু খরচ। সময়ের মালিককে পাওনা, গণ্ডা সমেত ফিরিয়ে দিতে হবে। আর দশটা বছর পার করতে পারলেই সেঞ্চুরি। দেখেছি অনেক, শিখেছি কাঁচকলা। আত্মজীবনী আবার কী? আত্মকথা, অর্থাৎ আমার কথা। তেমন বড় কোনও 'আমি' হলে জমজমাট একটা কাহিনি হতো। ছোট্ট আমির যত তুচ্ছ কথা। একদিন চোখ মেলেছিল, একদিন চোখ বুজেছিল, অন্ধকার থেকে আলোয়, আলো থেকে অন্ধকার। শত শত জীবন অদৃশ্য কালিতে এক মহাজীবনের দিনলিপি লিখে চলেছে।

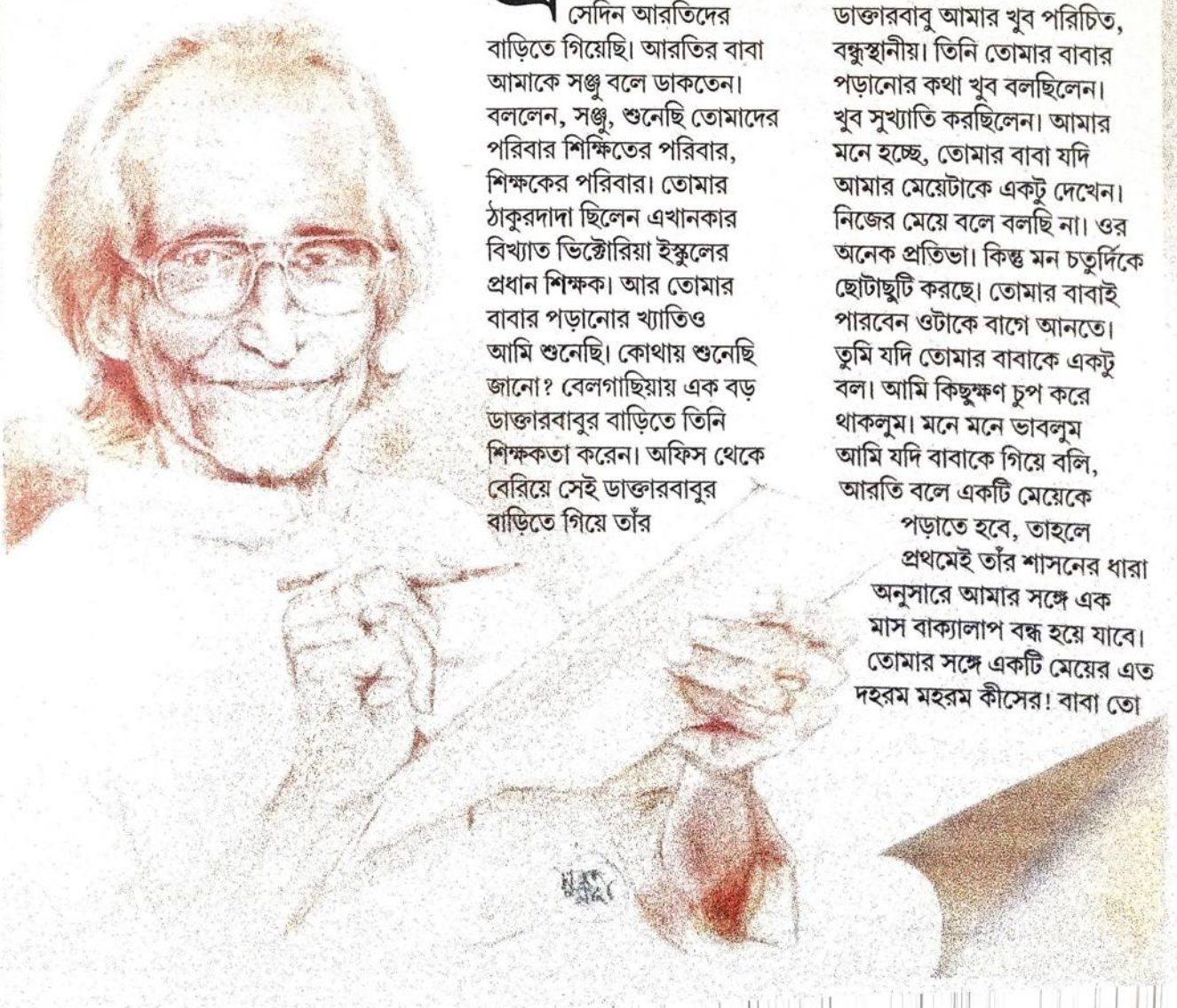

এই সময় একদিন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সেদিন আরতিদের বাড়িতে গিয়েছি। আরতির বাবা আমাকে সঞ্জু বলে ডাকতেন। বললেন, সঞ্জু, শুনেছি তোমাদের পরিবার শিক্ষিতের পরিবার, শিক্ষকের পরিবার। তোমার ঠাকুরদাদা ছিলেন এখানকার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর তোমার বাবার পড়ানোর খ্যাতিও আমি শুনেছি। কোথায় শুনেছি জানো? বেলগাছিয়ায় এক বড় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে তিনি শিক্ষকতা করেন। অফিস থেকে বেরিয়ে সেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়ান। সেই এফআরসিএস ডাক্তারবাবু আমার খুব পরিচিত, বন্ধুস্থানীয়। তিনি তোমার বাবার পড়ানোর কথা খুব বলছিলেন। খুব সুখ্যাতি করছিলেন। আমার মনে হচ্ছে, তোমার বাবা যদি আমার মেয়েটাকে একটু দেখেন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না। ওর অনেক প্রতিভা। কিন্তু মন চতুর্দিকে ছোটাছুটি করছে। তোমার বাবাই পারবেন ওটাকে বাগে আনতে। তুমি যদি তোমার বাবাকে একটু বল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলুম। মনে মনে ভাবলুম আমি যদি বাবাকে গিয়ে বলি, আরতি বলে একটি মেয়েকে পড়াতে হবে, তাহলে প্রথমেই তাঁর শাসনের ধারা অনুসারে আমার সঙ্গে এক মাস বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে একটি মেয়ের এত দহরম মহরম কীসের! বাবা তো

এই ধরনের মেলামেশা পছন্দ করেন না। আরতির বাবাকে আমি মেসোমশাই বলি। তাঁকে বললুম, মেসোমশাই, রবিবার বাবা বাড়িতে থাকেন। আপনি যদি কোনও রবিবার সকালে আমাদের বাড়িতে গিয়ে বাবাকে সরাসরি এ কথাটা বলেন তাহলে ভালো হয়। আমি বললে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে। আমার কথা শুনে, কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, তিনি মৃদু হেসে বললেন, বুঝেছি। ঠিক আছে। আমি নয়, আমার ওই বেলগাছিয়ার ডাক্তার বন্ধুকেই বলব, ওঁকে এই ব্যাপারটা বলার জন্য। বেশ কয়েকটা দিন যেন থমকে রইল। কী হয়, কী হয়।

তারপর এক রবিবার সকালে মেসোমশাই আরতিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবা তখন বসে আছেন বাইরের বারান্দায়, শ্বেতপাথরের টেবিলের কাছে। তাঁর বিশেষ চেয়ারটিতে। আমি যেন কিছুই জানি না। মেসোমশাই বাবাকে আরতিকে পড়ানোর ব্যাপারে বললেন। বাবা মেসোমশাইকে বললেন, ডাক্তারবাবু আপনার মেয়ের কথা আমাকে বলেছেন। কিন্তু সময় কোথায়, আমার তো অফিস। সপ্তাহে একটি মাত্র ছুটির দিন, রবিবার। সেদিন আবার বাড়িতে অন্য অনেক কাজ থাকে। তাও ঠিক আছে, আপনি একটা কাজ করুন, প্রতি রবিবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আপনার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি ওকে ঘণ্টা তিনেক সময় দিতে পারব। আর আমার বিশ্বাস, আমার পদ্ধতিতে ওইটুকু সময়ই যথেষ্ট হবে, যদি ওর বুদ্ধি থাকে। বাবা যখন এইসব কথা বলছেন, আরতি তখন আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর চোখে চোখে কথা বলছে। আমাকে ভীষণ সাবধানে থাকতে হচ্ছে। পাছে কিছু গোলযোগ হয়ে যায়। আমি যেন একেবারে উদাসীন। মনে হল, শুধু ডাক্তারবাবু বলেছেন বলে নয়, আরতি এবং মেসোমশাইকে বাবার বেশ পছন্দই হয়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে ওই জায়গা থেকে সরে বড় ঘরে চলে গেলুম। গিয়ে অকারণে পায়চারি শুরু করলুম। বইয়ের র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে কোনও কারণ নেই, একটা ঢাউস ডিকশনারি পেড়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলুম। কিন্তু কান পড়ে আছে ওদের কথাবার্তার দিকে। একটাই ভালো, আরতির বাবা অত্যন্ত ভদ্র। ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সুশ্রী চেহারা। উনি যে সরকারের উচ্চপদে আছেন, বাবা নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুর কাছে তা শুনেছেন। এরপর বাবা আমাকে ডাকলেন, কোথায় গেলে? আমি সেই মোটা অভিধানটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে বালক বিদ্যাসাগরের মতো তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তাই দেখে বাবা বললেন, ভেরি গুড। বছরে একবার অন্তত এই বইটায় হাত দিও। তোমার যা বানানের অবস্থা! সত্যিই তাই। তিনটে স, আর গোটা চারেক র নিয়ে আমি তো হিমশিম খেয়ে গেলুম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশি' বানান কী? কাল রাতে আমি 'স' লিখে কেলেঙ্কারি কাণ্ড করেছিলুম। আরতিকে দেখিয়ে বাবা বললেন, এই মেয়েটি তোমাদের ইস্কুলের মর্নিং সেকশনে পড়ে। তুমি যে ক্লাসে পড়, সেই ক্লাসেই। একে চেনো, এর নাম আরতি। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আরতি বানানে হ্রস্ব-ই, না দীর্ঘ-ঈ? আমি তো এমনি জড়োসড়ো, তার ওপর এই মুখে মুখে পরীক্ষা। তাও আবার কার সামনে, না আরতির সামনে! শেষ পর্যন্ত আমি সেখান থেকে সরে আড়ালে চলে গেলুম। তার কারণ আরতি মাঝে মাঝেই আমার দিকে তাকাচ্ছে, আর তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটছে। এক সময় আবার বাবা আমাকে ডাকলেন। তীব্র গলায় এবং একটু ধমকের সুরেই বললেন, এ বাড়ি থেকে কি সভ্যতা ভদ্রতা সব উবে গেছে? বাড়িতে দু'জন অতিথি এসেছেন। তাঁদের দিকে কারও নজর নেই কেন? আসলে বাবা বলতে চাইছেন তাঁদের জল, মিষ্টি কিছু দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমার ছোট পিসিমা অনেক আগে থেকেই রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। রবিবার সকালে আমাদের বাড়িতে একটা স্পেশাল ব্যাপার হয়। রবিবার সকালের জলযোগে থাকে সর্বমঙ্গলা অয়েল মিলের খাঁটি সর্ষের তেলে ভাজা আলুর চপ, বেগুনি। পিসিমা, সেই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমার পিসিমার রান্নার হাত খুবই ভালো। বাবার ট্রেনিংয়ে আরও উন্নত হয়েছে। বাবা নিজে হাতে তাঁকে কয়েকটি রান্না শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন না বলে বলা ভালো, আরও কতটা ভালো, কতটা স্বাদু করা যায় তার ট্রেনিং দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল তেলেভাজা। আলুর চপ, বেগুনি তৈরি করা। দ্বিতীয়টি হল ঘুগনি, তৃতীয়টি চাটনি, আর চতুর্থটি হল মোহনভোগ। বাবা নিজে হাতে রান্না করে তাঁকে ট্রেনিং দিয়েছেন। মোহনভোগ কী রকম হবে? চামচে দিয়ে তুলে ওপর থেকে ফেললে ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে, গায়ে গায়ে লেগে যাবে না। চাটনি কী রকম হবে? চাটনিতে আঙুলটা ঠেকিয়ে তুলে নিলে চাটনির যে রস আঙুলে লাগবে তা তিন-চার ইঞ্চি পর্যন্ত আঙুলের ডগায় সুতোর মতো টানটান হয়ে ঝুলে থাকবে। আমার পিতার পারফেকশনের কোনও তুলনা ছিল না। তিনি সব জানতেন। আর আমাকে বলতেন, ইউ মাস্ট নো সামথিং অব এভরিথিং।

আমাকে ভীষণ সাবধানে থাকতে হচ্ছে। পাছে কিছু গোলযোগ হয়ে যায়। আমি যেন একেবারে উদাসীন। মনে হল, শুধু ডাক্তারবাবু বলেছেন বলে নয়, আরতি এবং মেসোমশাইকে বাবার বেশ পছন্দই হয়েছে। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থেকে ওই জায়গা থেকে সরে বড় ঘরে চলে গেলুম। গিয়ে অকারণে পায়চারি শুরু করলুম। বইয়ের র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে কোনও কারণ নেই, একটা ঢাউস ডিকশনারি পেড়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলুম।

বাবার কথা শেষ হওয়া মাত্রই টেবিলে চলে এল গরম গরম আলুর চপ আর বেগুনি। আরতি বাবাকে বললেন, আমি কি আপনার অনুমতি নিয়ে একবার ভেতরে যেতে পারি? বাবা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও না, যাও না। আগে থেকেই আলাপ পরিচয় করে এই পরিবারেরই একজন হওয়ার চেষ্টা কর। তোমার বাবা তো শুধু লেখাপড়ার কথাই বলছেন। আমি তো সঙ্গীতের কথাও বলব। তোমার আঙুল আমি দেখে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে আছে, তোমাকে আমি এস্রাজ শেখাব।

আরতি আমার পাশ দিয়ে চলে

যেতে যেতে আমার হাতে একটা চিমটি কেটে গেল। অনেক কষ্টে আমি উহুহু শব্দটা চেপে রেখেছিলুম। রান্নাঘরের পাশের ঘরে একটা বিরাট তক্তপোশ ছিল। পূর্বদিকে একটা বড় জানলা। বিরাট একটা আকাশ যেন ঝাপটা মেরে ঘরে ঢুকতে চাইছে। কিছু দূরেই বড় বড় তিনটে নারকেল গাছ। আমাদের ঘুড়ির পথের চিরশত্রু। ফাঁকা একটা জায়গা, যেখানে আমাদের ডাং-গুলি খেলা হয়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই আমার পিসিমা, রানিদিদি, আরতি সব একাকার হয়ে গেল। মানুষে মানুষে মিলন হওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা স্রষ্টা আমাদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। আমরা বন্ধু হতে চাই। আমরা আত্মীয় হতে চাই। কিন্তু বিপরীত একটা শক্তি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঈশ্বরের সব কাজের শত্রু। তার নামই বোধহয় শয়তান।

সবশেষে ঠিক হল আরতি প্রতি রবিবার ছুটির দিন বিকেল পাঁচটার সময় এই বাড়িতে আসবে। বাবার কাছে পড়বে অঙ্ক আর ইংরেজি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল একবার রান্নাঘরে যাই। কিন্তু খুব সংযম দেখিয়ে বাইরের ঘরেই বসে রইলুম। শুনতে লাগলুম। একটু আগে যাঁরা অপরিচিত ছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা হয়ে উঠলেন যেন কতকালের বন্ধু। তাঁদের অন্যান্য বড় বড় আলোচনা। নানা প্রসঙ্গ। বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, পার্টিশন, সমাজের অধঃপতন, দুর্নীতি। সারা পৃথিবী ঢুকে পড়ল দোতলার এই ছোট্ট বসার ঘরে। আরতির বাবা থেকে থেকে বলতে লাগলেন, আপনি এ দেশে কেন জন্মালেন! আপনার উচিত ছিল ইউরোপে জন্মানো! একটু চেষ্টা করলেই আপনি অক্সফোর্ড কী কেমব্রিজের অধ্যাপক হতে পারতেন। বাবার এই প্রশংসায় আমার ভেতরের কলসিটা যেন উপচে পড়ল। হি ইজ মাই ফাদার। আমি তাঁর সন্তান। বেশ একটা গর্ব এল মনের মধ্যে। একটা সংকল্প এল। বাবা বলতেন, লাইক ফাদার লাইক সন। হতে হবে, আমাকেও হতে হবে। কানে আসছে রানিদিদি আর আরতির কথা। টুকরো টুকরো হাসির শব্দ। আর ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হলেন আমার দাদু। ছ'ফুট লম্বা। এতটাই ফর্সা, নাকের ডগা, দুটো গাল একটু লালচে। তাঁর হাতে সব সময় একটা ছাতা থাকে। সেটা রাখতে রাখতে বললেন, একটু লেট করে ফেলেছি। সব শেষ হয়ে গেল নাকি? বাবা বললেন, আপনার জন্য সব সময়, সব কিছু রেডি থাকে। এখন কথা হল আমরা যতটা গরম পেয়েছি, আপনি ঠিক ততটা পাবেন কি না। দাদু বললেন, তাহলে একবার সরেজমিনে দেখতে হয়। দেখে আসি। বড় স্নেহের গলা তাঁর। আমার পিসিমার নাম নীহার। নীহার আমি এসেছি— বলতে বলতে উত্তরের রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সেখানে আরতিকে দেখে বললেন, এই বউ কথা কও পাখিটা কোথা থেকে উড়ে এল? সঙ্গে সঙ্গে আরতি নিজেই উত্তর দিল, ওই নিম গাছ থেকে।

দাদু গলা চড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, তাঁর দেওয়া সেই প্রিয় নামে, পান্তুরানি।
আরতি প্রথমে বুঝতে পারেনি। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, অথচ ডাকছেন পান্তুরানি বলে। অবাক হয়ে দাদুকে জিজ্ঞেস করলে, এটা আপনি কী নামে ডাকলেন! রানি তো মেয়েদের নাম। দাদু বললেন, ও আমার কাছে কখনও রানি, কখনও রাজা, কখনও প্রজা। ওই যে আমার তুলসী। তুলসী আমার মায়ের নাম।

— তোর নাম কী রে?

— আরতি।

— কোন ঠাকুরকে আরতি করিস?

— সব ঠাকুরকে।

— গান জানিস?

— একটু একটু।

— দেখি শোনা তো।

আরতি তো কলের গান। গাইতে বললেই সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে দেয়। এখনও সঙ্গে সঙ্গেই গেয়ে উঠল, আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ!

দাদুর চোখ দুটো দেখে মনে হল তিনি মোহিত হয়ে গিয়েছেন। বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, ওরে তোরা এই ময়নাটাকে খাঁচায় ভরে রাখ!

বাবা এবং আরতির বাবা যেখানে বসে আছেন, সেখানে আর একটা চেয়ারের খুব অভাব। শ্বেতপাথরের টেবিলটা এমন কায়দায় তৈরি, তিনজন বসা যেতে পারে, একটু ঠেসাঠেসি হয়ে যাবে। দাদু রান্নাঘরের তক্তপোশে গিয়ে বেশ আরাম করে বাবু হয়ে বসলেন। যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবতা। বসেই বললেন, নীহার আমার একটা আবদার আছে। পিসিমা বললেন, বলুন। দাদু বললেন ক'দিন ধরে খুব পলতার বড়া খেতে ইচ্ছে করছে। পিসিমা বললেন, পলতার বদলে যদি শিউলি পাতার বড়া করে দিই চলবে? দাদু লাফিয়ে উঠলেন। আরে, এই মেয়েটাকে কেন বাঁকুড়ায় নির্বাসন দিয়েছিলেন আমাদের যোগীন্দ্রনাথ! আরতি যেখানে বসে আছে, বারান্দার রেলিং দিয়ে নীচের দিকে তাকালেই আমাদের বাগান। সেখানে একটা বড় শিউলি গাছ। আরতি বলল, আমি পাতা তুলে আনব? রানিদিদি বলল, যদি পড়ে টড়ে যাও। আরতি বলল, পড়ে যাব কেন! আমি সরু পাঁচিলের ওপর দিয়েও হাঁটতে পারি। দাদু শুনে বললেন, তুমি কি কাঠবেড়ালি? আমি কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছি। দাদু গলা চড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, তাঁর দেওয়া সেই প্রিয় নামে, পান্তুরানি। আরতি প্রথমে বুঝতে পারেনি। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, অথচ ডাকছেন পান্তুরানি বলে। অবাক হয়ে দাদুকে জিজ্ঞেস করল, এটা আপনি কী নামে ডাকলেন! রানি তো মেয়েদের নাম। দাদু বললেন, ও আমার কাছে কখনও রানি, কখনও রাজা, কখনও প্রজা। ওই যে আমার তুলসী। তুলসী আমার মায়ের নাম। আমি বেশ জানি এই নামটি দু'চারবার উচ্চারণ করলেই দাদুর বড় বড় চোখ ভরা পুকুরের মতো ভরে উঠবে। আরতি একটু থমকে গেল। আরতি কবি, আরতি গান গায়, আরতি ছবি আঁকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, দিন শেষের সূর্যাস্ত দেখে। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরে চুপ

করে গেল। আমার মুখেই সে শুনেছে, আমি যখন খুব ছোটি, আমার মা চলে গিয়েছেন। প্রবীণারা এ বাড়িতে এলেই বারে বারে একটা কথাই বলেন, আহারে মা মরা ছেলে, মা মরা ছেলে। আমার মা ছিলেন আমার দাদুর একমাত্র কন্যা। মানুষ বোধহয় ছেলের চেয়ে মেয়েকেই বেশি ভালোবাসে। আরতি আর রানিদিদি শিউলি পাতা তুলতে চলে গেল। পিসিমা আর এক গ্রন্থ আলুর চপ, বেগুনি ভাজায় ব্যস্ত হলেন। মোটা অভিধানটাকে আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে আমি গীতাঞ্জলিটা টেনে বের করলুম। পেড়ে নিলুম। রবীন্দ্রনাথের কিছু গান আমাকে শিখতেই হবে। তা না হলে আরতির সঙ্গে কম্পিটিশনে আমি হেরে যাব। আমার মামা একজন নামকরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার কোনও সুযোগ হবে না। বাবা অবশ্য আমাকে কয়েকটা গান শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটা গান প্রায়ই আমাকে বাবার এস্রাজের সঙ্গে গাইতে হয়। গানটি হল:

'সন্ধ্যা হলো গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো— সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার আধার মাঝে হোক না জড়ো।।'

এই গানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক চোখের জল। এই গানের পথ ধরে আমরা দু'জনেই ভেসে ভেসে চলে যাই দূর অতীতে। দক্ষিণের জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে সন্ধ্যার অন্ধকার। বাবার কাঁধে ঝকঝকে কালো এস্রাজ। হাতে ছড়ি। যার হাতলটা আবার হাতির দাঁতের। ঘরের এক কোণে একটি মৃদু আলো। মস্ত বড় একটা মাদুর। পাতলা একটা কাপড় একপাশে পড়ে আছে। এস্রাজের খোল। সেটি রেশমের কাপড়ের। বাবার নিজের হাতে তৈরি।

ভোরবেলা পূব আকাশে নরম সূর্য মাথা তুলছে। জামতাড়ার ফাঁকা মাঠে আমার মা দাঁড়িয়ে আছেন। পরে আছেন জাম রঙের শাড়ি। শাড়িটি আবার আমার মেজো জ্যাঠাইমার উপহার। তিনি রেঙ্গুন থেকে নিয়ে এসেছিলেন। মায়ের গলায় ঝুলছে অপূর্ব এক সুন্দর পুঁতির মালা। এটিও আমার জ্যাঠাইমার তৈরি। বার্মার পাথরের দানা দিয়ে। দাদুর মতোই আমার মা ছিলেন দীর্ঘদেহী। সবাই বলতেন, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। পদ্মের মতো ভাসমান দু'টি চোখ। মায়ের এই মূর্তিটি আমার বুকে ছাপাই ছবির মতো আমি বহন করে চলেছি। যতদিন না ছাই হয়ে যাব, ততদিন বহন করেই চলব। বাইরে বাবার দুর্ভেদ্য কঠিন একটা আবরণ। তিনি যেন একটি লোহার মানুষ। কিন্তু আমি জানি তিনি ছিলেন অতি আন্তরিক এক প্রেমিক। একবারই মাত্র তাঁর কাঠিন্যের বাঁধন আলগা হয়ে একটা অন্য মানুষ বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই অন্য মানুষটি পরে একদিনই আমার কাছে তাঁর মনের দরজাটি খুলে সেই দিনটির কথা বলে ফেলেছিলেন। একদিনই। একথা আমি আগেও বলেছি।

দাদুর মতোই আমার মা ছিলেন দীর্ঘদেহী। সবাই বলতেন, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। পদ্মের মতো ভাসমান দু'টি চোখ। মায়ের এই মূর্তিটি আমার বুকে ছাপাই ছবির মতো আমি বহন করে চলেছি। যতদিন না ছাই হয়ে যাব, ততদিন বহন করেই চলব। বাইরে বাবার দুর্ভেদ্য কঠিন একটা আবরণ। তিনি যেন একটি লোহার মানুষ। কিন্তু আমি জানি তিনি ছিলেন অতি আন্তরিক এক প্রেমিক।

এক রবিবারের রোদ ঝলমলে দুপুর। খাওয়া-দাওয়ার পর পুব মুখে বসে পিসিমার তৈরি করে দেওয়া দু'খিলি মিঠে পান মুখে পুরেছেন। একহাতে পানের বোঁটায় চুন ধরে বসে আছেন মাদুরে। পাশে অপেক্ষায় আছে এস্রাজ। ঘরের পুব দেওয়ালে অসাধারণ সুন্দর একটা আয়না ঝুলছে। বেলজিয়াম গ্লাসের। আয়নাটি খুব সম্ভবত বিদেশি। আর আমার ধারণা, আয়নাটি এই বাড়িতে এসেছিল আমার মায়ের সঙ্গে। বাঙালি পরিবারে তখনও নানা রকমের কাবার্ড, হালকায়দার আলমারি, লকার লাগানো স্টিলের আলমারি— এসব আসেনি। আমার মায়ের একটা মস্ত বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক ছিল। যাকে বলা হতো পোর্টম্যানটো। এটিও মনে হয় বিদেশে তৈরি। কারণ ভেতরটা ছিল এনামেল করা। আর প্রচুর ফুলকারি। বাবা সেদিন আমাকে যে ঘটনাটি বলেছিলেন, সেটি হল— সকালে অফিসে বেরবার সময় দেখলেন আমার খুব জ্বর হয়েছে। আমি তখন একেবারেই শিশু। অফিসে কাজ করতে করতে তিনি আমাকে নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে, কাজ ফেলে অফিস থেকে আবার ফিরে এসেছেন বাড়িতে। এইবার তিনি বলছেন, মানে বর্ণনা দিচ্ছেন— আমি ঘরে ঢুকে দেখলুম তোমার মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে চুল আঁচড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা চুল। কোমর ছাপিয়ে অনেকটা নেমে গিয়েছে। আমি দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছি। কপালের মাঝখানে হাতির দাঁতের কাঠি দিয়ে সিঁদুরের টিপ পরছে। আমি দাঁড়িয়েই আছি। সে এক দৃশ্য। এইবার আমি যেই বলেছি, এখন জ্বর কত? তোমার মা চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, তুমি ফিরে এসেছ! যে মানুষ শেলি, কিটস, বায়রন, শেক্সপিয়র লাইনের পর লাইন মুখস্থ বলে যেতে পারেন। যিনি ছাতে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা ফুল ফুটিয়ে, মাদুর পেতে শুয়ে, আমাকে পাশে শুইয়ে আকাশের বুকে গোটা তারাদের দেখিয়ে নক্ষত্রমণ্ডল চেনান, পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ দেখে বলেন, তোমার দাদু একদিন ওইভাবেই উড়ে যাবেন। যাঁর এস্রাজে রাত বারোটার সময় পিলু বারোয়া রাগ মোচড় দিয়ে দিয়ে হারিয়ে যাওয়া বিরহের কথা বলে। তাঁর দ্য আয়রন ম্যান উপাধিটি অনেক কষ্টে অর্জিত একটি ছদ্মবেশ মাত্র।

আমি জানি তিনি আরতিকে প্রথম দেখাতেই নিজের কন্যার মতো ভালোবেসে ফেলেছেন। যে চপলতা দেখলে তিনি আমাকে শাসন করবেন, আরতির মধ্যে সেই চপলতা দেখলে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠবে। হয়তো বলবেন, মনে মনে, একটা ফোয়ারা। বলবেন তাঁর বিশুদ্ধ ইংরেজিতে—স্প্রিঙ্কলিং স্পিরিট।

*(চলবে)*

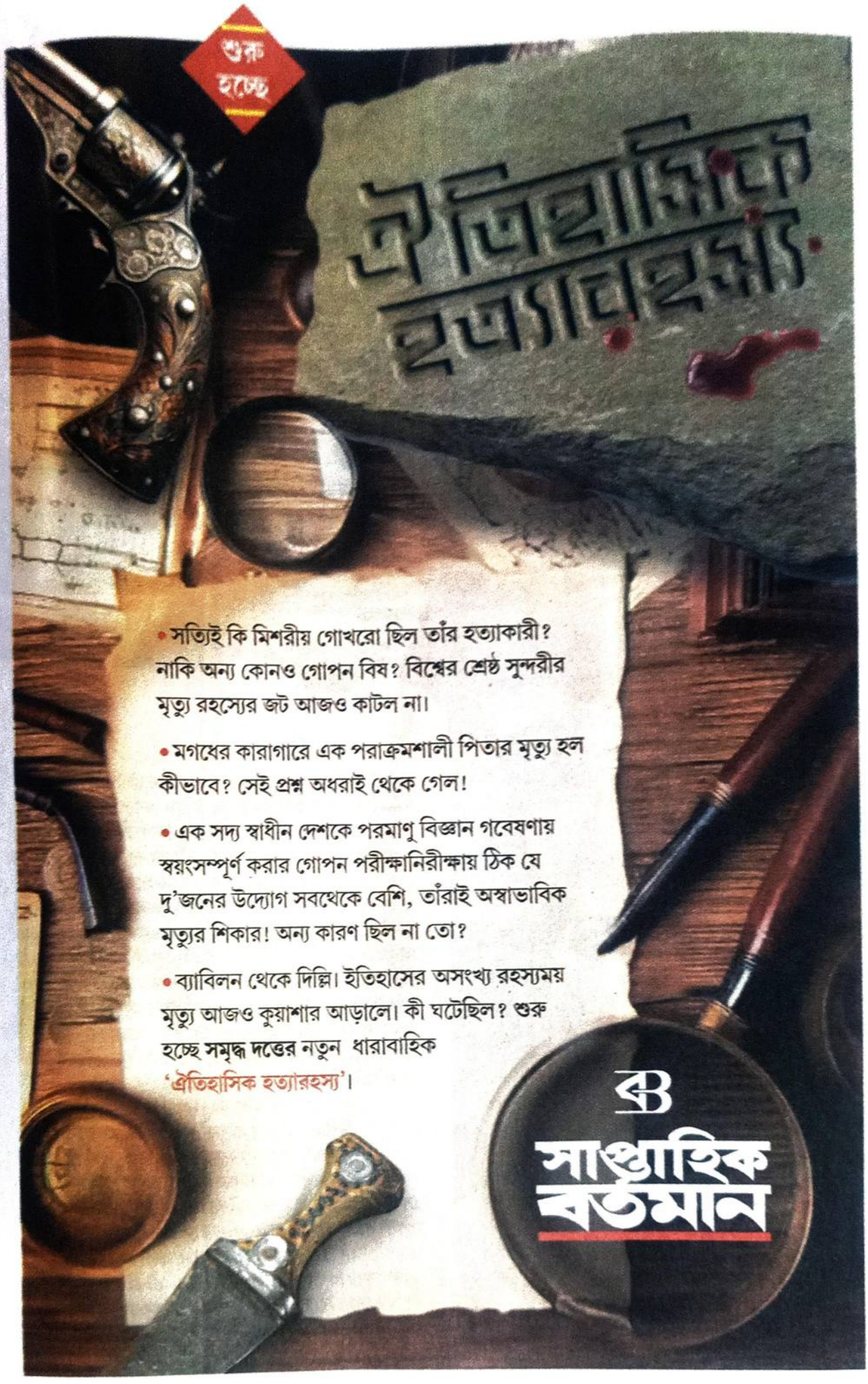
শুরু হচ্ছে
ঐতিহাসিক হত্যারহস্য
• সত্যিই কি মিশরীয় গোখরো ছিল তাঁর হত্যাকারী? নাকি অন্য কোনও গোপন বিষ? বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর মৃত্যু রহস্যের জট আজও কাটল না।
• মগধের কারাগারে এক পরাক্রমশালী পিতার মৃত্যু হল কীভাবে? সেই প্রশ্ন অধরাই থেকে গেল!
• এক সদ্য স্বাধীন দেশকে পরমাণু বিজ্ঞান গবেষণায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করার গোপন পরীক্ষানিরীক্ষায় ঠিক যে দু'জনের উদ্যোগ সবথেকে বেশি, তাঁরাই অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার! অন্য কারণ ছিল না তো?
• ব্যাবিলন থেকে দিল্লি। ইতিহাসের অসংখ্য রহস্যময় মৃত্যু আজও কুয়াশার আড়ালে। কী ঘটেছিল? শুরু হচ্ছে সমৃদ্ধ দত্তের নতুন ধারাবাহিক 'ঐতিহাসিক হত্যারহস্য'।
সাপ্তাহিক বর্তমান

# প্রাচীন মিশরের নারীদের কথা

দীপঙ্কর বসু

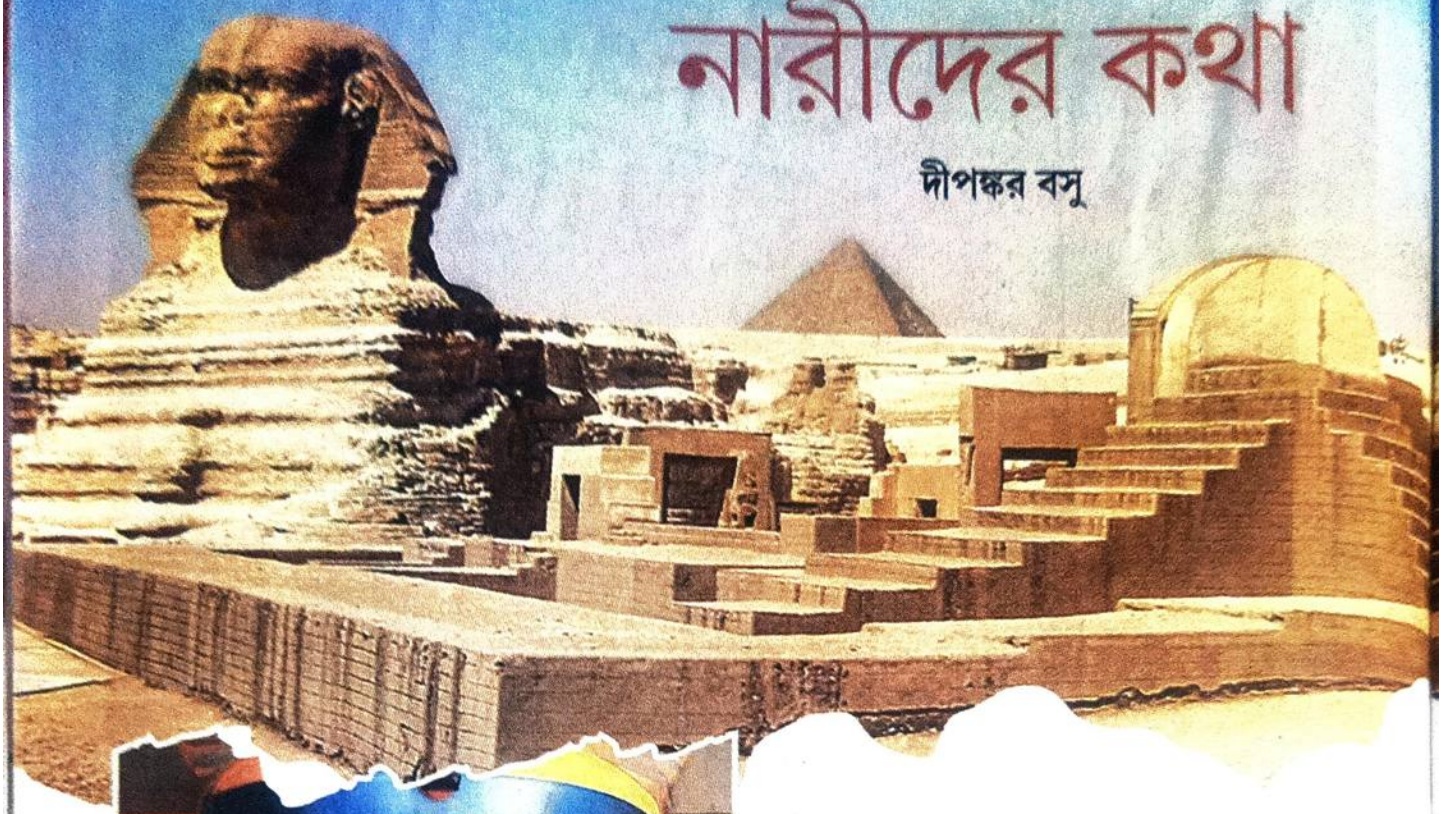

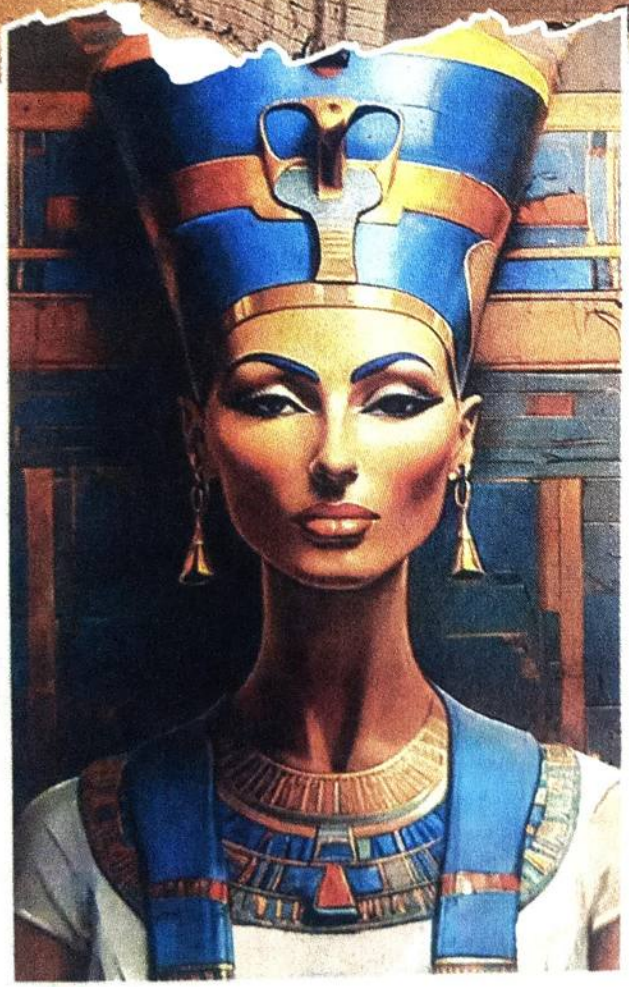

প্রাচীন মিশরে নারী পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা— দুই-ই ছিল অবাধ। তখনকার মিশরের মহিলারা আইনের চোখে ছিল দক্ষ ও সক্ষম। মজার ব্যাপার, সেই সময়ের গ্রিক মহিলাদের সর্বক্ষেত্রে কোনও পুরুষ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। টলেমির রাজত্বে বিভিন্ন কাজ এবং শিক্ষার জন্য আসা গ্রিক নারীরা মিশরীয় রমণীদের অভিভাবক ছাড়া কাজকর্ম করতে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দরবারেও আইনানুযায়ী নারীদের স্থান ছিল পুরুষদের সমান। প্রাচীন মিশরে শাসকদের তালিকাতেও বেশ কয়েকজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। এমনকী সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ফারাওদের মধ্যে ছিল কয়েকজন নারী। চিকিৎসক, সরকারি পদাধিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ, পুরোহিতের পেশাতেও ছিল নারীদের অবাধ বিচরণ।

## নারীর অধিকার এবং ভূমিকা

প্রাচীন মিশরীয় সমাজে মায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ফারাও থেকে আরম্ভ করে সমাজের অন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্মৃতিস্তম্ভেও খোদাই করা থাকত মায়েদের নাম। এমনকী কোনও স্মৃতিস্তম্ভে বাবার নাম থাকলেও তুলনায় মায়ের নাম সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হতো। শুধু ভাস্কর্যে নয়, সাহিত্যেও তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন রাজত্বে ফারাওয়ের স্ত্রীদের মূর্তির আকার ফারাওদের সমান ছিল। এটি স্ত্রীদের সমান পদমর্যাদার পরিচয় বহন করে। মিশরীয় সমাজে পরিবারের বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নিত মহিলারা। বাড়ির সমস্ত কিছুর

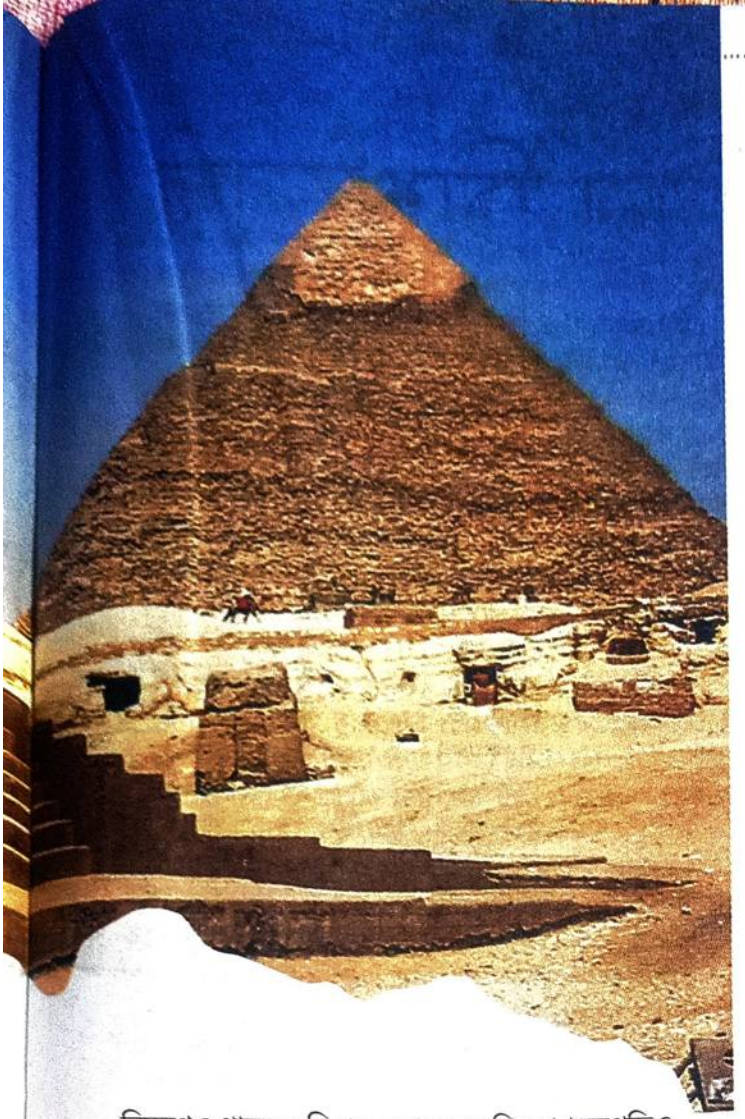

নিয়ন্ত্রণও থাকত মহিলাদের হাতে। বেশিরভাগ সম্পত্তিও থাকত মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে। পরিবারের আইনগত বিষয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করত মহিলারাই। ঘরের বাইরে যে কোনও কাজ করার স্বাধীনতাও ভোগ করত প্রাচীন মিশরের নারীরা। প্রভূত স্বাধীনতা থাকার কারণে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। মিশরের নারীদের পুরুষের মতো নিজস্ব সম্পত্তি রাখার অধিকার ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ করত নারীরা। মায়ের হাত থেকে সম্পত্তি যেত মেয়ের হেফাজতে। নিজের সম্পত্তির তদারকির দায়িত্বও থাকত মহিলাদের হাতে। ইচ্ছে করলে সম্পত্তি বিক্রির অধিকার ছিল তাদের। শুধু তাই নয়, সম্পত্তি কিনতেও পারত। মহিলারা আইনি চুক্তির অংশীদার, উইলের নির্বাহক, আইনি দলিল দস্তাবেজের সাক্ষীও হতে পারত। নিজের নামে শিশুদের দত্তকও নিতে পারত তারা।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীন মিশরে রানি ও রাজমাতাদের প্রভাব এবং ক্ষমতার কারণেই সাধারণ নারীদের বিশেষ অধিকার ও প্রভূত ক্ষমতা ছিল। প্রাচীন কোনও সভ্যতায় নারীর এমন স্বাধীনতা এবং বিশেষ অধিকার ছিল বিরল ঘটনা। বিখ্যাত ফারাও প্রথম আহমস সর্বদা তাঁর মা প্রথম আহহতেপ এবং তাঁর প্রধান রানি নেফারতারির কাছে পরামর্শ নিতেন। বিধবারা স্বামী না থাকার কারণে বিশেষ আইনি স্বাধীনতা ভোগ করত। তারা নিজের জমি ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারত। দান করা এবং ধার করার স্বাধীনতাও তাদের ছিল। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে একটি মজাদার ব্যাপার লক্ষ করা যায়। প্রাচীন রাজত্ব থেকে মধ্যবর্তী রাজত্বে আসার পথে ক্রমশই কর্তৃত্বের জায়গায় মহিলাদের উপস্থিতি কমে যায়। এটি নিঃসন্দেহে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। নতুন রাজত্বের সময়ে মহিলারা আইনি পরিচয় এবং কর্তৃত্ব ফিরে পায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল ভাস্কর্যে মহিলাদের আকার ও আকৃতি দেখে। এই আকার ও আকৃতি সে সময়ের পুরুষদের সমান ছিল যা মহিলাদের পদমর্যাদা এবং সম্পদের পরিচয় বহন করত।

**পেশা:** মিশরে বেশিরভাগ নারী স্বামীর সঙ্গে চাষবাসের কাজ করত। স্বামী-সন্তানদের অনুপস্থিতিতে খামার ও ব্যবসা দেখাশোনার সব দায়িত্বও পালন করত মহিলারা। সমাজের উচ্চবর্গের মহিলাদের অনেকেই গৃহের ভৃত্য ও অন্যদের কাজকর্মের তদারকি করত। সেই সঙ্গে বাড়ির ছোটদের শিক্ষার দায়িত্বও ছিল তাদের উপর। অনেকেই আবার বস্ত্রশিল্পে বয়নশিল্পীর কাজ করত। লাহুন নামের একটি স্থানে উদ্ধার করা খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ শতকের একটি প্যাপিরাসে ৬ জন মহিলা বয়নশিল্পীর নাম পাওয়া গিয়েছে। সম্পন্ন ঘরের নারীরা সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব আয়ার উপর অর্পণ করে সুগন্ধি প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজ করতে যেত। অনেকেই আবার রাজদরবার এবং মন্দিরে নর্তকী, গায়িকা ও সঙ্গীতজ্ঞের কাজ করত। কেউ কেউ আবার শারীরিক কসরত প্রদর্শনের কাজও করত। এই সব কাজ সে সময়ের উচ্চশ্রেণির সমাজে সম্মানজনক কর্ম হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সব শ্রেণির মহিলাদের জন্যই দু'টি অত্যন্ত প্রচলিত কাজ ছিল সঙ্গীত বিষয়ের কাজ এবং শবানুগমনকারীর কর্ম। অভিজাত বংশের নারীরা দেবদেবীদের পুজোর জন্য পুরোহিতের কাজও করতে পারত। পুরোহিত হওয়ার আগে সবাইকে অক্ষরজীবী এবং লিপিকারের দায়িত্ব সামলাতে হতো। এর জন্য কয়েক বছর ধরে তাদের কঠিন অধ্যয়ন করতে হতো। অধ্যয়ন শেষে এই মহিলারা পুরোহিত, শিক্ষিকা এবং চিকিৎসকের পেশায় যুক্ত হতে পারত। চিকিৎসকের পেশা মিশরে ছিল প্রচণ্ড সম্মানের। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকা মেডিক্যাল স্কুলে তখন দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসত। গ্রিক মহিলা চিকিৎসক অ্যাগনোডিসকে মহিলা হওয়ার কারণে এথেন্সে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে দেওয়া হয়নি। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইজিপ্টে (মিশর) চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে গ্রিসে ফিরে গিয়ে পুরুষবেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন শুরু করেন। সে এক অন্য গল্প। লিপিকারের কর্ম ও অধ্যয়ন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে খুব বেশি পুরুষ বা মহিলারা এই বিষয়ে উৎসাহিত হতো না। বেশিরভাগ সময় এইসব পেশার সঙ্গে যুক্ত বাবা-মায়েদের সন্তানরাই এই অধ্যয়নে উৎসাহিত হতো।

ব্যবসার প্রধানও হতে পারত মহিলারা। নতুন রাজত্বের সময়ের ললনা নেনোফার হলেন জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রাচীন মিশরে মহিলাদের চিকিৎসক হওয়ার উদাহরণও আছে। চতুর্থ রাজবংশের সময়ে এমনই একজন নামী চিকিৎসক ছিলেন ললনা পেষেশেত। এঁদের কথা পরে বলছি। মহিলাদের অনেক পেশাকে সম্মান জানানোর জন্য তাদের সমাধিতে উৎকীর্ণ করা হতো পেশার উপাধিকে। এমন কয়েকটি উপাধি হল মহিলা চিকিৎসক, মহিলা উজির ও বিচারক, ভোজনশালার মহিলা অধিকর্তা, শবানুগমনকারী পুরোহিত, মহিলা তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব ২০৪০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮২ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী রাজত্বে মহিলাদের কাছে সবথেকে সম্মানজনক উপাধি

ছিল 'ভগবান আমুনের স্ত্রী'। এটি অত্যন্ত গৌরবজনক একটি খেতাব। এর অধিকারী মহিলাদের কাজ ছিল প্রধান পুরোহিতকে ধর্মীয় উৎসবের সময় সাহায্য করা, দেবতার তত্ত্বাবধান করা। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৭০ থেকে ১০৬৯ সাল পর্যন্ত নতুন রাজত্বের সময় এই উপাধির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় মধ্যবর্তী সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০৬৯ থেকে ৫২৫ সাল) 'ভগবান আমুনের স্ত্রী', উপাধির মহিলাদের ক্ষমতা রাজার সমান হয়ে যায়। নতুন রাজত্বের সময়ে এই উপাধির সবচেয়ে বিখ্যাত মহিলা ছিলেন ফারাও হাটশেপসুট।

## পরিবার ও বিবাহ

মিশরীয় সমাজে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে সন্তানের জন্ম দেওয়া। বিভিন্ন চিত্র এবং স্থাপত্যে স্পষ্ট যে পারিবারিক সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার ছিল। রাজ পরিবারে বিবাহের ক্ষেত্রে ভাই বোনের বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। দেবতা ওসাইরিসের সঙ্গে তাঁর বোন দেবী আইসিসের বিয়ে ছিল এই ধরনের বিবাহের উদাহরণ। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে সাধারণভাবে এক বিবাহের প্রথা চালু থাকলেও আর্থিকভাবে সম্পন্ন পুরুষদের ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। সাধারণভাবে প্রথম স্ত্রী সন্তান ধারণে অসমর্থ হলে তবেই পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা চিন্তা করত।

প্রাচীন মিশরে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনত নিষিদ্ধ না থাকলেও, বিবাহ বিচ্ছেদ কিন্তু সহজ ছিল না। ডিভোর্সের যন্ত্রণার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করার জন্য ৩৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নতুন বিবাহ বিচ্ছেদের আইনে স্বামীদের উপরে প্রভূত পরিমাণে আর্থিক বোঝা চাপানো হয়। এর ফলে মহিলাদের হাত শক্ত হয়। ত্রিশতম রাজবংশের সময়ের একটি বৈবাহিক চুক্তি সংবলিত প্যাপিরাস মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মা বাবারাই পাত্র-পাত্রী স্থির করে বিবাহের ব্যবস্থা করত।

## বিখ্যাত কয়েকজন নারী

প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত নারীদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হবে প্রাচীন মিশরের মহিলা শাসকদের কথা। ৩১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ রাজত্বে প্রায় ২১ জন মহিলা শাসকের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৪ জন প্রভাবশালী মহিলা শাসক— মেরিনেইথ, নিমাথ্যাপ, খেন্ট কাউস, দ্বিতীয় আন খেসেনপেপি, নেইথহিক্রেট, দ্বিতীয় অ্যারসিনো, সোবেকনেফেরু, প্রথম অ্যাসোটেপ, আহমোস নেফারতারি, হাতশেপসুত, নেফারতিতি, তাউসরেট, প্রথম ক্লিওপেট্রা, সপ্তম ক্লিওপেট্রা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফারাও ছিলেন। আবার কেউ কেউ নাবালক, বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ রাজার অভিভাবকরূপে মিশর শাসন করেছেন।

প্রাচীন মিশরের এই মহিলাদের মধ্যে আবার পাঁচ জন বিভিন্ন কারণে ইতিহাসের পাতায় বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন।

**মেরিনেইথ**— প্রথম মহিলা শাসক হিসাবে মিশর শাসন করেছেন। প্রথম রাজত্বের রাজা ডিজারের কন্যা মেরিনেইথ। তিনি তাঁর পুত্র ডেনের অভিভাবক রূপে ২৯৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিশরকে শাসন করেন। তিনি ছিলেন ইজিপ্টের প্রথম রাও নারমের প্রপৌত্রী। অ্যাবিডসে প্রথম রাজত্বের বিভিন্ন ফারাওয়ের সঙ্গে মেরিনেইথের সমাধি থাকায় তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবের পরিচয় পরিচয় পাওয়া যায়।

**সোবেকনেফেরু**— প্রাচীন মিশরের প্রথম মহিলা ফারাও। তাঁর নামের অর্থ হল 'সোবেকের সৌন্দর্য'। তিনি ছিলেন মধ্য রাজত্বের দ্বাদশ রাজবংশের শেষ শাসক। তিনি তাঁর ভাই কিংবা স্বামী চতুর্থ আমেনেমহাতের মৃত্যুর পর পিতা তৃতীয় আমেনেমহাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে বসেন। প্যাপিরাসে লেখা প্রাচীন মিশরীয়দের তৈরি রাজাদের এক তালিকা 'তুরিন কিং লিস্ট' অনুসারে তাঁর শাসনকাল ৩ বছর, ১০ মাস ২৪ দিন স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম শাসক যাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল কুমির দেবতা 'সোবেক'-এর নাম। হারগেহে আবিষ্কৃত একটি প্যাপিরাসে সেখেমসোবেকনেফেরু নামের একটি স্থানের উল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এখানেই ছিল সোবেকনেফেরুর সমাধিস্থল।

**হাতশেপসুত** (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০৭-খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫৮)— ঐতিহাসিকদের অনুমোদিত মহিলা ফারাওদের তালিকায় হাতশেপসুত ছিলেন দ্বিতীয় নাম। তিনি ছিলেন ফারাও প্রথম থুতমোস এবং রাজমহিষী আহমোসের কন্যা। স্বামী দ্বিতীয় থুতমোস-এর মৃত্যুর পরে হাতশেপসুত তাঁর তিন বছরের সৎপুত্র তৃতীয় থুতমোস-এর অভিভাবক হিসাবে ইজিপ্ট শাসন করলেও আট বছর পরে তিনি পুত্রের সঙ্গে ফারাও হিসাবে যৌথভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা একসঙ্গে প্রায় ২২ বছর মিশর শাসন করেন। হাতশেপসুত ছিলেন অষ্টাদশ রাজবংশের পঞ্চম ফারাও।

তিনি ছিলেন (মহিলা এবং পুরুষ মিলিয়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাওদের মধ্যে অন্যতম। দেশকে এক সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হিক্সসের আমলে মিশরের যে বাণিজ্য পথগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তিনি তা নতুন করে তৈরি করেন। হাতশেপসুত পুন্ত নামের এক দেশে (বর্তমান আফ্রিকার রাজ্য এরিত্রিয়া ) এক সফল বাণিজ্য অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখান থেকে তিনি তাঁর দেশে প্রচুর পরিমাণে সোনা, আবলুস কাঠ, আগরবাতি, প্রক্রিয়াজাত গন্ধরস, পশুচর্ম ইত্যাদি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এর পরে ব্যাবলস এবং সিনাই উপদ্বীপেও অভিযান করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি মোটের উপর শান্তিপূর্ণ থাকলেও শাসনকালের প্রথমদিকে নুবিয়া এবং কানানে তাঁকে সামরিক অভিযান চালাতে হয়েছিল।

তাঁর সময়ে দেশে শিল্পকর্মের জোয়ার এসেছিল। হাতশেপসুত কার্নাক মন্দির কমপ্লেক্সের সংস্কার করেন। তিনি সেখানে ২০০ ফুট লম্বা দু'টি স্মারকস্তম্ভ তৈরি করান। এখানে লাল পাথরের একটি উপাসনালয়ও তৈরি করেন। এছাড়া পাখেট অঞ্চলে

পাথর কেটে একটি মন্দিরেরও নির্মাতা তিনি। তবে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল দেইর এল বাহারিতে তাঁর অপূর্ব সমাধি মন্দির।

**নেফারতিতি**— মিশরে ধর্মীয় বিপ্লবের জন্য বিখ্যাত অষ্টাদশ রাজবংশের ফারাও আখেনাতেনের প্রধান রাজমহিষী ছিলেন নেফারতিতি। অনেকের মতে আমরানা সময়কালে নেফারতিতি আখেনাতেনের সঙ্গে মিলিতভাবে মিশর শাসন করতেন। তিনি ছিলেন তুতেনখামেনের সৎ মা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশকে তিনি নিজের ক্ষমতায় ফারাও হিসাবে ইজিপ্টকে শাসন করেন।

নেফারতিতি শব্দের অর্থ 'আগমন হয়েছে এক সুন্দরী নারীর'। তাঁর বাবা মায়ের বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। তিনি সুপরিচিত তাঁর মস্তকে শোভিত পূর্ণাকার সুন্দর মস্তক আবক্ষের জন্য। মিশরের চিত্র ভাস্কর্যে নেফারতিতিকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যা একমাত্র ফারাওদের পক্ষেই মানানসই। নেফারতিতির শত্রুদের আক্রমণ এবং হত্যা করার চিত্রও পাওয়া গেছে।

**সপ্তম ক্লিওপেট্রা**— সাধারণভাবে ক্লিওপেট্রা নামে খ্যাত প্রাচীন মিশরের এই রানি ৩০০ বছর ধরে চলতে থাকা টলেমি রাজত্বের শেষ স্বাধীন শাসক। তিনি দ্বাদশ টলেমির কন্যা। জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৬৯ সালে। দ্বাদশ টলেমির মৃত্যুর পরে একাদিক্রমে তাঁর দুই ভ্রাতা ত্রয়োদশ টলেমি ও চতুর্দশ টলেমি ও পুত্র পঞ্চদশ টলেমি সিজারের সঙ্গে প্রধান শাসক হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব ৫১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মিশরকে শাসন করেন। মিশর ছাড়াও সাইপ্রাস, এখনকার লিবিয়ার কিছু অংশ, মধ্যপ্রাচ্যের অন্য অনেক অঞ্চল নিয়ে তৈরি এক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল তাঁর শাসনের অধীন। যদিও বিভিন্ন চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে ক্লিওপেট্রা বিখ্যাত তাঁর সৌন্দর্য ও জুলিয়াস সিজার এবং মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে রোমান্টিক সম্পর্ক নিয়ে।

কিন্তু নানা প্রাচীন তথ্য এবং ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে ক্লিওপেট্রা ছিলেন বিদুষী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং নয়টি ভাষায় পারদর্শী মহিলা ফারাও। এছাড়াও একাধারে একজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও রসায়নবিদ। ক্লিওপেট্রা মুদ্রা এবং প্রসাধনী দ্রব্যের উপর বইও লিখেছিল। জানতেন কী করে শক্তিশালী নৌবহর বানাতে ও বিদ্রোহ দমন করতে হয়। মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি পরিচালনায়ও ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। স্থাপত্যবিদ্যার নির্মাণে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

দেন্দারার কাছে দেবী হ্যাথরের মন্দির সম্প্রসারণ করে। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি, স্টেডিয়াম, মার্ক অ্যান্টনি ও জুলিয়াস সিজারের সম্মানে তৈরি আলেকজান্দ্রিয়ায় সিজারিয়াম মন্দিরও ক্লিওপেট্রার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে অতিথিদের জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করেন যার মধ্যে হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসির অনেক চিত্র আছে।

**মহিলা চিকিৎসক মেরিট তা** — ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় রাজবংশের রাজসভায় ফারাওয়ের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন মহিলা চিকিৎসক মেরিট তা। এখন পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা চিকিৎসক। সাক্কারায় তাঁর সমাধিতে পুত্রের লেখা যে লিপি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় এ কথা। সে সময়ে তাঁর চিকিৎসা এবং আবিষ্কার বহু মানুষের বিভিন্ন রোগ এবং ক্ষতস্থানের কষ্ট লাঘব করেছে। মহিলাদের কাছে তিনি ছিলেন এক অনুপ্রেরণা।

**মহিলা চিকিৎসক পেযেশেত** —মিশরের চতুর্থ রাজবংশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন পেযেশেত। ছিলেন সে সময়ের সমস্ত মহিলা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি 'রাজার পরিচিত' এই পদবি পেয়েছিলেন। রাজার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পুরোহিতদের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। পেযেশেত সাইস মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যায় পাশ করা এক চিকিৎসক। গিজায় আখেত-হেতেপের সমাধির খনন করে তাঁর মা পেযেশেতের এক স্মৃতিস্তম্ভ পাওয়া গেছে।

**মহিলা উজির নেবেত** — মিশরের প্রাচীন রাজত্বের শেষভাগে ষষ্ঠ রাজবংশের ফারাও পেপি প্রথমের রাজত্বে প্রধান উজির ছিলেন নেবেত। তিনি ছিলেন মিশরের প্রথম মহিলা উজির। তিনি ফারাওয়ের ভাগনি ছিলেন। পিরামিড নগরীর তত্ত্বাবধায়ক আমির খুইয়ের পত্নী ছিলেন নেবেত। অ্যাবিডসে তাঁর পুত্র দিজাউ-এর সমাধিতে নেবেতের নামের উল্লেখ আছে।

**মহিলা বীণাবাদক হেকেনু এবং গায়িকা ইতি** — মহিলা বীণাবাদক হিসাবে প্রথম যাঁর নাম মিশরের ইতিহাসে পাওয়া যায় তিনি প্রাচীন রাজত্বের সময়ের বীণাবাদক হেকেনু। পঞ্চম

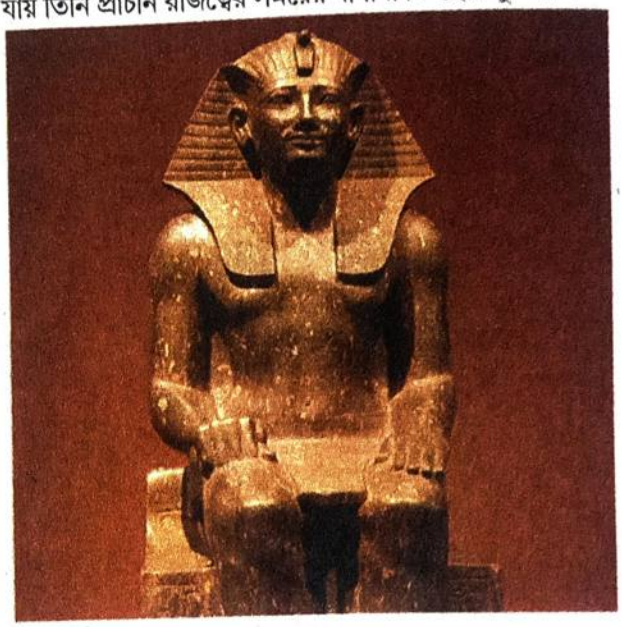

রাজবংশের সময়ে গায়িকা ইতির সঙ্গে তাঁর যুগলবন্দি বিখ্যাত ছিল। ইতি মিশরের প্রাচীনতম গায়িকা। ফারাও খাফরের প্রথম সন্তান রাজকুমার নিকাউরে, তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানের সমাধিক্ষেত্রের এক নকল দরজায় যুগলবন্দি হেকেনু ও ইতির একটি অসাধারণ ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে।

•••

দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে পৃথিবীর শুরুতে যখন ওসাইরিস ও আইসিস পৃথিবী শাসন করতেন, দেবী আইসিস তখন মানবতার যে ধর্মগুলি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল নারী এবং পুরুষের সমানাধিকার। এই ঐতিহ্য পালনের উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরের সমাজে নারীর মর্যাদায়।

প্রাচীন মিশরের নারীরা তখনকার অন্যান্য প্রাচীন সমাজের নারীদের চেয়ে অনেক বেশি আইনি ক্ষমতা এবং সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করত। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মিশরের নারীরা প্রভাব এবং প্রতিপত্তিতে সেই সময়ের অন্যান্য দেশের সমাজের নারীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন।

## শ্যামাশ্রী দত্ত

ভারতের হৃদয়ভূমি মধ্যপ্রদেশ। আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস যাত্রার রাজপথে একদা সঙ্গী হয়েছিল শিল্প। সৃষ্টি হয়েছিল এক অবিস্মরণীয় স্থাপত্যকীর্তির। স্থাপত্য না বলে যাকে 'পাথরের কাব্যকথা' বললেই সঠিক বলা হয়। এই আশ্চর্য সৃষ্টিকে চেনে সারা বিশ্ব খাজুরাহ শিল্পমন্দির নামে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে প্রথমে জব্বলপুর পৌঁছলাম। সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে তৃতীয় দিন সকালে রওনা দিলাম খাজুরাহর উদ্দেশে। দূরত্ব ২৫৫ কিমি। জব্বলপুর থেকে বেরিয়ে লোকালয় ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে উত্তর অভিমুখে। ঘণ্টা দু'য়েক পর ঢুকে পড়লাম পান্না রিজার্ভ ফরেস্ট চত্বরে। সবুজ পান্নার হলুদ-কালো রত্নের দেখা না মিললেও হরিণ দেখেছিলাম অনেক। পান্নার পর কেবলই উত্তেজনা, কখন পৌঁছব সেই অনিন্দ্যসুন্দরের সামনে!

মধ্যপ্রদেশের একেবারে উত্তর প্রান্তে ছত্রপুর জেলায় বিন্ধ্য পর্বতের পরিখার মাঝে যুগ যুগ ধরে ভারতের ইতিহাস, ধর্মচেতনা, শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্য সুন্দর এই শিল্পমন্দিরগুলো। পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। অস্ত-রবির রক্তিম আভায় তখন আকাশ জুড়ে রঙের বাহার। হোটেলে পৌঁছেই জানতে পারলাম সন্ধে সাড়ে ছ'টায় শুরু হবে খাজুরাহর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। প্রতিদিন প্রথমে ইংরেজি, তারপর হিন্দিতে এক ঘণ্টার শো হয়। তবে প্রতিটি শো'য়ের জন্য আলাদা টিকিট কাটতে হয়। কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে সবুজ ঘাসের এক উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে বসলাম। অন্ধকার আকাশের নীচে জেগে রয়েছে মন্দির চূড়াগুলো। শো শুরু হতেই সূক্ষ্ম আলোর রশ্মি পড়ল সেগুলির উপর।

বরাহ অবতার ভাস্কর্য

# পাথর কাব্যের দেশ খাজুরাহ

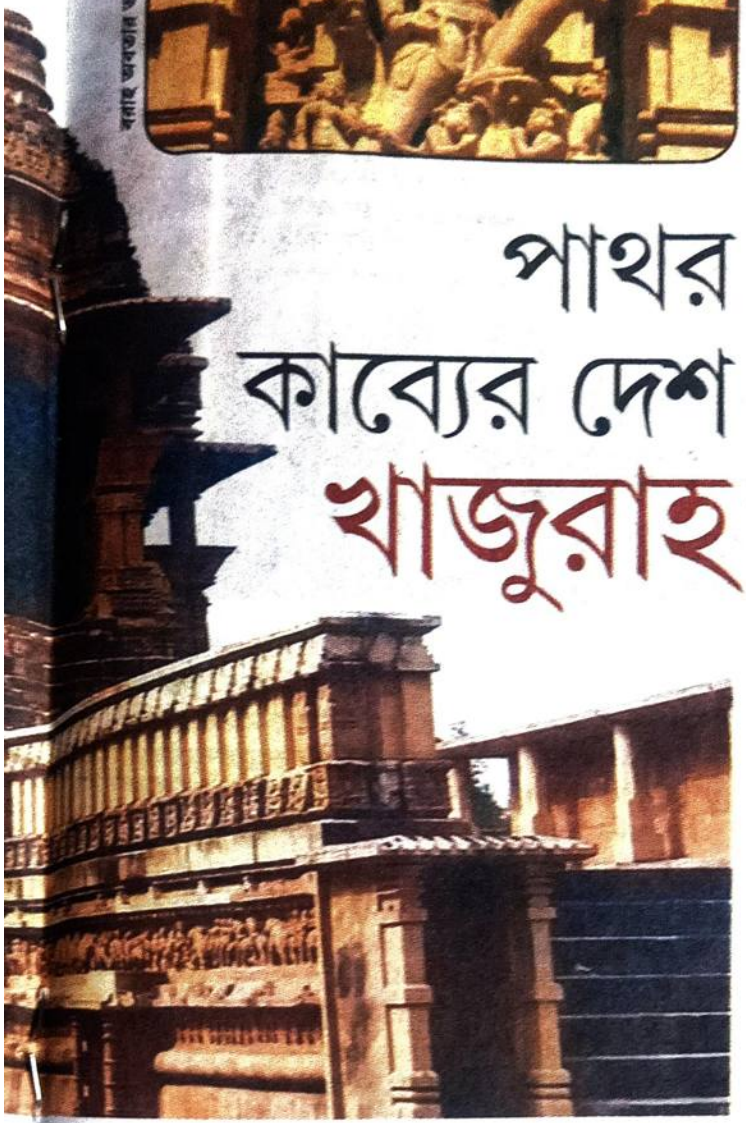

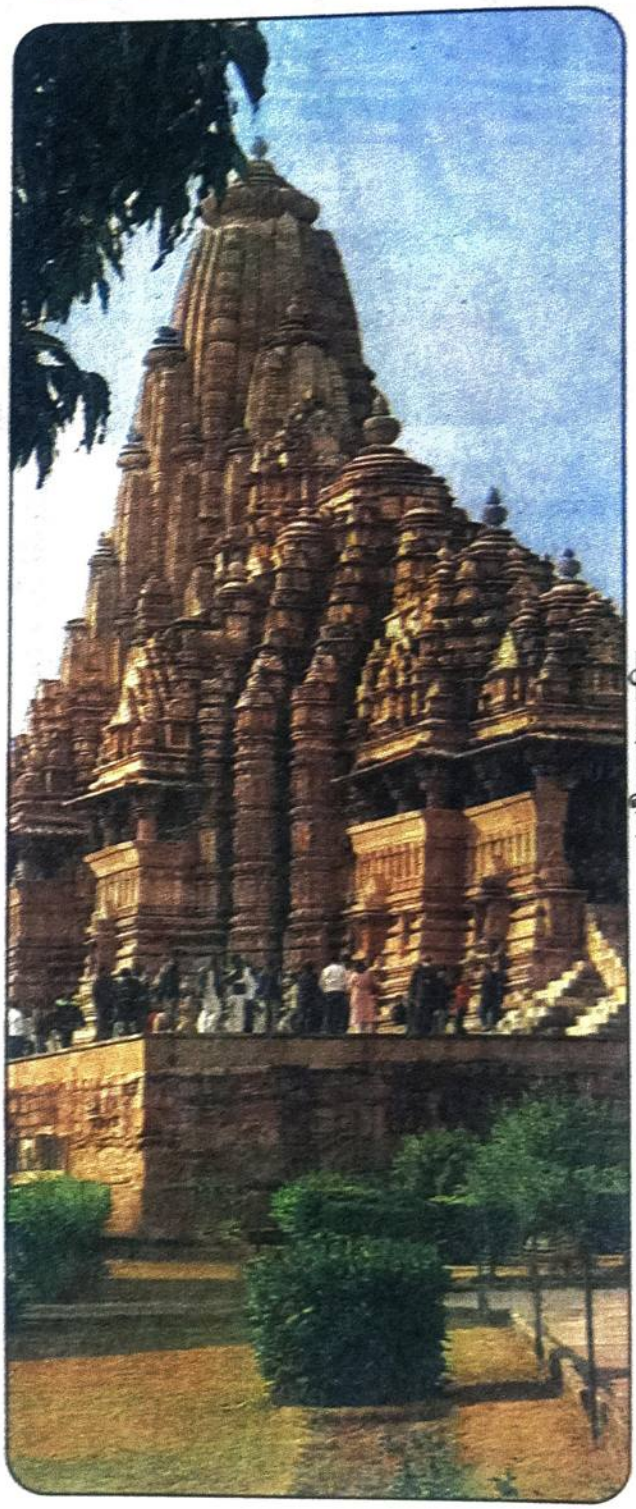

কান্দারিয় মহাদেব মন্দির

সুরের মূর্ছনার সঙ্গে জলদগম্ভীর স্বরে মন্দির সৃষ্টির ইতিহাস শুনতে শুনতে কখন যেন পৌঁছে গেলাম চান্দেল রাজবংশের গৌরবগাথায়। শো শেষ হয়ে গেল। একটা ঘোর নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। সারারাত প্রতীক্ষায় কাটল, কখন সকাল হবে। আমি দিনের আলোয় সাদা চোখে দেখব পাথরের কাব্যগাথাকে।

খাজুরাহ মন্দিরের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। বহুশ্রুত একটি মিথ বা পুরাকথা আবর্তিত হয় এই বিশ্ববন্দিত স্থাপত্যকে ঘিরে। চন্দ্রদেবতা ও বারাণসীর এক রূপবতী বিধবা কন্যা হেমবতীর প্রেম ও মিলনে তাঁদের পুত্রসন্তান চন্দ্রবর্মনের জন্ম হয়। এই চন্দ্রবর্মনই প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত চান্দেল রাজবংশ। কথিত আছে, চন্দ্রদেব স্বয়ং হেমবতীকে বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশধরের দ্বারা সৃষ্ট মন্দির হেমবতীকে অবৈধ প্রেমের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবে। তাই বুঝি চন্দ্রদেব ও হেমবতীর কামের নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরগাত্র জুড়ে শৈল্পিক রতি দৃশ্য খোদিত হয়েছে।

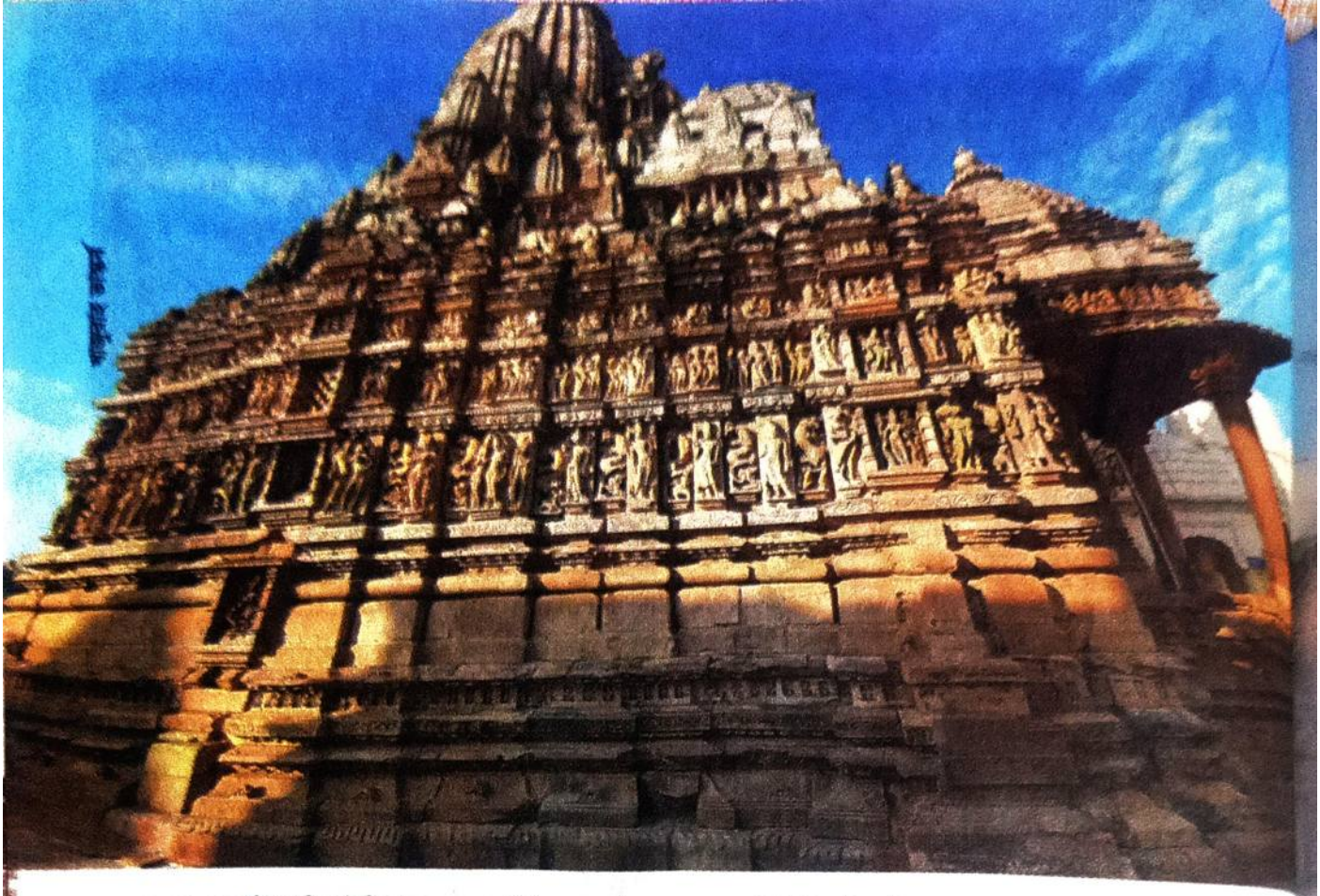

এ তো গেল মিথ! কিন্তু ইতিহাস? মধ্যযুগে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী বিন্ধ্য পর্বতঘেরা জেজাকভুক্তির (অধুনা বুন্দেলখণ্ড) চান্দেল রাজপুতরা দশম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত মূলত কান্যকুব্জের গুর্জর-প্রতিহার রাজাদের অধীনে সামন্তরাজা হিসেবে পরিচিত ছিল। দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চান্দেলরাজ যশোবর্মন নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করলে বুন্দেলখণ্ডে ঐতিহাসিক চান্দেল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁদের তিনটি রাজধানী ছিল। যথাক্রমে— মাহোবা, খাজুরাহ ও কালিঞ্জর। বহু ইতিহাসের সাক্ষী, প্রাচীন দুর্ভেদ্য কালিঞ্জর দুর্গের অধিকারী হিসেবে চান্দেল রাজারা কালিঞ্জরাধিপতি উপাধি গ্রহণ করতেন। শিল্পের পৃষ্ঠপোষক চান্দেল রাজারা নতুন রাজ্যজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করতেন শিল্প-সমৃদ্ধ এইসব মন্দির। এভাবেই ৯৫০ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চান্দেল রাজবংশের বিভিন্ন রাজাদের শাসনকালে ৮৫টি মন্দির গড়ে উঠেছিল খাজুরাহতে। সুলতানি শাসনের প্রাক্কালে গজনির সুলতান মামুদের আক্রমণ ঘটেছিল এখানে। যদিও সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন চান্দেলরাজ কেশরী বিদ্যাধর। এরপর সুলতানি সাম্রাজ্যের পত্তনে চান্দেলদের চারশো বছরের রাজত্বের গৌরবসূর্য অস্তমিত হলে মন্দিরগুলোও তলিয়ে যায় বিস্মৃতির আঁধারে। ইতিহাসে রয়ে যায় এর নাম। ১০২২ সালে আল বিরুনির লেখায় এবং ১৩৩৫-এ বিখ্যাত আরবি পর্যটক ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণের স্মৃতিকথায়। অবশেষে ১৮৩৮ সালে ব্রিটিশ সার্ভেয়ার টি এস বার্টের নজরে আসে ঘন জঙ্গলে ঢাকা এই অপরূপ সৃষ্টি এবং এভাবেই আবার পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে আসে খাজুরাহ। ১৯৮৬ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত হয় ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক এই কালজয়ী সৃষ্টি। বর্তমানে টিকে থাকা ২২টি মন্দিরকে অবস্থান অনুসারে ওয়েস্টার্ন, ইস্টার্ন ও সাদার্ন এই তিনটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। হিন্দু মন্দিরগুলো পশ্চিম ও দক্ষিণভাগে এবং জৈন মন্দিরগুলো রয়েছে পূর্বভাগে। খাজুরাহের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরগুলো আছে পশ্চিমভাগে। যাদের 'ওয়েস্টার্ন গ্রুপ অব টেম্পলস' বলা হয়। তিন চত্বরেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে।

দ্বিতীয় দিন সকালে গাইডের কাছে ইতিহাসের নানান কাহিনি শুনতে শুনতেই টিকিট কেটে পৌঁছে গেলাম খাজুরাহর পশ্চিম প্রান্তের মন্দির প্রাঙ্গণে। একটি বিস্তীর্ণ সবুজ প্রাঙ্গণের চারপাশে ছোটবড় মিলিয়ে দশটিরও বেশি বেলেপাথরে নির্মিত মন্দির রয়েছে এখানে। মন্দিরগুলো উত্তর ভারতীয় ঘরানার নাগর শৈলীতে নির্মিত। মন্দির কাঠামোয় বিভিন্ন স্তর। যথাক্রমে মুখ্যমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। কোনও কোনও মন্দিরের সঙ্গে আছে প্রদক্ষিণ পথ। মন্দিরগুলোর দেওয়ালে পাথরের উপর অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি, অপ্সরা বা সুরসুন্দরীদের সাজসজ্জা ও বিভিন্ন বিভঙ্গের ব্যঞ্জনা। মানবজীবনের নানান অনুষঙ্গ এবং নারী-পুরুষের নানা ভঙ্গিমার অপরূপ ভাস্কর্যগুলোতে মূর্ত হয়ে আছে ভারতের শাশ্বত-অন্তরাত্মা। মন্দিরগুলোর প্রবেশপথের মাথায় সূক্ষ্ম নকশার ওঁ চিহ্নের মতো তোরণ। পবিত্রতার প্রতীক স্বরূপ গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি খোদিত সেখানে। কয়েকটি মন্দিরের সামনে দু'পাশে শঙ্খসহ অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিলা আছে। হিন্দুধর্মের এমন বহু খুঁটিনাটি ছড়িয়ে আছে খাজুরাহের সর্বত্র। সিংহের মাথাযুক্ত শার্দূলের মূর্তিও দেখা যায় সব মন্দিরে। প্রাচীন বিশ্বাস, এরা শত্রুদমন করে রাজাকে রক্ষা করত।

তবু খাজুরাহ বলতেই চোখে অবধারিত ভেসে ওঠে নারী-পুরুষের মিলনমূর্তির ছবি। বিপুল পরিমাণ ভাস্কর্যের মধ্যে কামকলার অবয়বগুলোকে ঘিরেই তার যাবতীয় প্রচার বা অপপ্রচার! 'টেম্পল অব লাভ' নামে খ্যাত খাজুরাহর ইরোটিক

মূর্তিগুলো প্রধানত রয়েছে পশ্চিম-চত্বরের মন্দিরগুলোতে। বিশেষ করে লক্ষ্মণ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির ও কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের দেওয়ালে। তবে তা মাত্র ১০ শতাংশ। পাশাপাশিই ধর্ম এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানান উপজীব্য খোদিত আছে আরও অনেক বেশি। খাজুরাহ-শিল্পীরা জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। তাই তাঁদের শিল্পে বাদ পড়েনি কোনওকিছুই। ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে পাথরের বুকে শ্লীল-অশ্লীলের স্থূলদৃষ্টির ঊর্ধ্বে তাঁরা খোদাই করেছিলেন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের চির-অমর ভাষ্য।

লক্ষ্মণ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, চিত্রগুপ্ত মন্দির, জগদম্বী মন্দির ও সর্বোপরি কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির— হাজার বছর পরেও মধ্য ভারতের এই প্রান্তিক অঞ্চলে সারা পৃথিবীর শিল্পরসিকদের টেনে আনে। স্থপতিদের কারিগরি দক্ষতা ও শৈল্পিক নান্দনিকতাকে কুর্নিশ জানাতে শব্দভাণ্ডার শূন্য মনে হয়। প্রবেশপথের বাঁদিকে চান্দেলরাজ যশোবর্মনের শাসনকালে বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্মিত জগদ্বিখ্যাত লক্ষ্মণ মন্দির। কারুকার্যময় বেদির দেওয়ালে সারিবদ্ধ হাতি, ঘোড়া, সৈন্যদল, শিকারি মানুষ ও নারী-পুরুষ মিলনের নানা মূর্তির সম্ভার। সিঁড়ির উপরে মূল মন্দিরের দেওয়ালগুলোর কেন্দ্রে বিষ্ণুর নানা অবতারের মূর্তির অদ্ভুত বিন্যাস। তাকে ঘিরে নাচের ছন্দে দেবদাসী, নাগকন্যা, নৃত্যরত গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্মশ্রুশোভিত ব্রহ্মা ও অপ্সরা পরিবৃত নানান দেবতার মূর্তিতে ভারতীয় শিল্পকলা অমর হয়ে আছে। গর্ভগৃহে ত্রি-মস্তক ও চতুর্বাহু বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর বিরল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মণ মন্দিরের বিপরীতে বরাহ মন্দিরে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের মূর্তিটি বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। লক্ষ্মণ মন্দিরের উত্তর-পূর্বে খাজুরাহের আর এক রত্ন-আকর যশোবর্মনের পুত্র মহারাজ ধঙ্গর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ মন্দির। প্রবেশপথের উত্তর ও দক্ষিণে একজোড়া করে সিংহ ও হাতি প্রহরারত। শিবের প্রতি নিবেদিত এই মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের বিশ্ববিখ্যাত পত্রলেখা নারী, শিশুক্রোড়ে জননী, সিক্তবসনা সুন্দরীর জীবন্ত ভাস্কর্যের সৌন্দর্য স্বর্গের দেবদেবীদেরও হার মানায়। এছাড়া মুকুটধারী রাজারানি, শিব-পার্বতীর যুগলমূর্তি শিব-শক্তি, প্রহরীদের শ্মশ্রুমণ্ডিত কীর্তিমুখ এবং মিলনমূর্তিগুলো প্রথম দর্শনেই চিরকালের মতো মনে গেঁথে যায়। বিশ্বনাথের মুখোমুখি শিবানুচর নন্দীর মন্দির, ভিতরে অলঙ্কৃত নন্দীর মূর্তি। বিশ্বনাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে চিত্রগুপ্ত মন্দির। সূর্যদেবের উদ্দেশে নির্মিত এই মন্দিরের গর্ভগৃহে সপ্তাশ্বরথে দণ্ডায়মান সূর্যদেব হলেন দেবতা। এই মন্দিরে দেবদেবী ও সুরসুন্দরীদের ভাস্কর্যই বেশি। একদেহে ১১টি মস্তকবিশিষ্ট একটি বিষ্ণুমূর্তি সবচেয়ে বেশি মোহিত করে দর্শনার্থীদের। চিত্রগুপ্ত মন্দিরের ডানদিকে ধঙ্গর পুত্র গণ্ডদেবের প্রতিষ্ঠিত জগদম্বী মন্দির। প্রথমে বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্মিত হলেও পরে এটি দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। আকারে ছোট হলেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অতুলনীয়। মন্দিরের দেওয়ালে অষ্ট দিকপাল, যম এবং অষ্টভুজ-শিবমূর্তির ভাস্কর্য ভাষায় বর্ণনার অতীত, আর মিথুন মূর্তিগুলোতে যেন অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রকাশ। গর্ভগৃহের ভাস্কর্যখচিত দরজায় শার্দুলসহ বিষ্ণু এবং অভ্যন্তরে পার্বতী এখানে মূল দেবতা। জগদম্বী ও কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের মাঝে একটি ছোট ভগ্নপ্রায় বিগ্রহহীন মহাদেব মন্দির, কিন্তু তার দ্বারপ্রান্তে চান্দেলদের শৌর্যের প্রতীক রিক্তহস্ত মানবের সিংহ আলিঙ্গন মূর্তিটি দেখার মতো।

জগদম্বী মন্দিরের ডানদিকে মহারাজ বিদ্যাধরের শাসনকালে নির্মিত খাজুরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির। পশ্চিম-চত্বরে ঢোকা মাত্রই বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল

বিস্ময়কর ভাস্কর্য

এই আশ্চর্য স্থাপত্যটির দিকে। সবচেয়ে বেশি অলঙ্করণ সমৃদ্ধ এই মন্দিরটিই খাজুরাহর সর্বোচ্চ এবং সর্ববৃহৎ মন্দির। সুউচ্চ বেদির উপরে বিন্যস্ত এই মন্দিরের শীর্ষটি ছোট ছোট ৮৪টি শিখর-যুক্ত একটি প্রকাণ্ড পাহাড়চূড়ো আকৃতির শিখর দ্বারা গঠিত। যার তুলনা জগৎ সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই। মন্দিরের সিলিং, বেসমেন্ট, দেওয়াল, সন্ধি, লিনটেলের উড়ন্ত দেবদেবী, অপ্সরা, লতাপাতা, শার্দুল, নানা ভঙ্গিমায় নারী-পুরুষের অগণিত ভাস্কর্যের অপরূপ নান্দনিকতা কতক্ষণ যে বাকরুদ্ধ


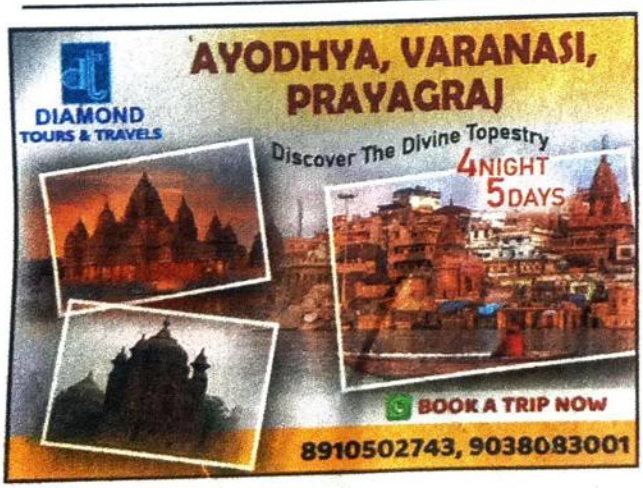

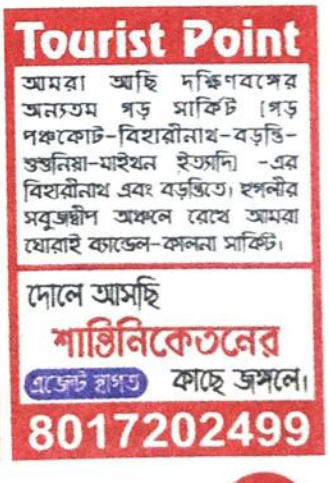

হয়ে দেখেছি, তবু আশ মেটেনি। কুলুঙ্গিতে গণেশ, বীরভদ্র, সপ্তমাতৃকা মূর্তিও যথারীতি চিত্তাকর্ষক। চারপাশে দেবমূর্তির মাঝে মিথুনমূর্তিগুলো যেন স্বর্গ-সুষমায় মোড়া, মানব-মানবীর প্রেম এখানে দেবতার আশীর্বাদ ধন্য। প্রবেশপথের মকর তোরণটি মন শুদ্ধ করার জন্য, তারপর গর্ভগৃহে শিব-দর্শন। কী আশ্চর্য, অথচ কত চরম সত্যটি এখানে ব্যক্ত হয়েছে শিল্পের মাধ্যমে।

পশ্চিম-চত্বরের পর গেলাম খাজুরাহের পূর্ব প্রান্তের মন্দিরগুলো দেখতে। পূর্ব ও দক্ষিণভাগের মন্দিরে প্রবেশমূল্য লাগে না। চান্দেল শাসনকালে খাজুরাহের পূর্ব অংশে জৈন সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। ফলে খাজুরাহ শৈলীতেই বেশ কিছু জৈন মন্দির গড়ে উঠেছিল এই চত্বরে। সম্প্রীতির এই বাতাবরণ মুগ্ধ করে আজও। পার্শ্বনাথ মন্দির, আদিনাথ মন্দির ও শান্তিনাথ মন্দির— এই তিনটি এখন দেখতে পাওয়া যায়। ঘণ্টাই মন্দিরটি অনেকাংশে বিধ্বস্ত। এদের মধ্যে পার্শ্বনাথ মন্দিরের ভাস্কর্য সবচেয়ে সুন্দর ও শোভাময়। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের মন্দিরে পুজো প্রথা এখন চালু না থাকলেও ইস্টার্ন গ্রুপের জৈন-মন্দিরগুলোতে এখনও উপাসনা প্রচলিত আছে। গ্রামের অন্যদিকে জবারী ও বামন এই দুই বিষ্ণু মন্দির এবং একটি ব্রহ্মা মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল পূর্বগোষ্ঠীতে।

দক্ষিণ চত্বরের দু'টি বিখ্যাত মন্দির— দুলাদেও ও চতুর্ভুজ মন্দির। দুলাদেও মন্দিরটিই চান্দেল রাজবংশের দ্বারা তৈরি শেষ মন্দির। কিছুটা দক্ষিণ ভারতীয় ছাঁচে গড়া এই মন্দিরের মহামণ্ডপটি অষ্টভুজাকৃতি। মন্দিরের দেওয়ালে দেবদেবী, অপ্সরা ও মিথুনমূর্তি অসাধারণ। মন্দিরদ্বারের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্তিটিও তুলনাহীন। গর্ভগৃহে দেবতা শিব। চতুর্ভুজ মন্দিরের দেবমূর্তিটি সবিশেষ পা থেকে কোমর পর্যন্ত কৃষ্ণ, কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত নারায়ণ। আর মস্তকে শিব। মন্দিরের দেওয়ালে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটিও নজরে পড়ে। খাজুরাহতে একমাত্র চতুর্ভুজ মন্দিরেই কোনও মিথুন ভাস্কর্য দেখা যায় না।

কিন্তু মন্দিরে কেন আদিরসের উপস্থাপনা! ঐতিহাসিকদের মতে, সেকালের সমাজে যৌনতা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষ করে ভারতে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতায় তন্ত্রচর্চা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তন্ত্রের উপাসক চান্দেল রাজারা একটি চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরও খাজুরাহতে নির্মাণ করেছিলেন। কালের প্রভাবে যেটি লয় পেয়েছে এখন। মন্দিরগুলোতেও শিব ও শক্তির মূর্তিই সবচেয়ে বেশি। খাজুরাহ নামটির সঙ্গে জুড়ে আছেন স্বয়ং শিব। সংস্কৃত শব্দ খর্জুরবাহোর খর্জুরের অর্থ বৃশ্চিক, বাহোর অর্থ বহনকারী— বৃশ্চিকবহনকারী অর্থাৎ স্বয়ং মহাদেব। তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। মিথুন মূর্তিগুলো তাই শুভ লক্ষণের পরিচয়বাহী। শঙ্করাচার্যের প্রভাবে প্রজাদের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবণতা রোধ করতে জীবনধর্মী শিক্ষার বার্তা দেওয়াও প্রয়োজনীয় ছিল সেসময়ে। যৌনতা জীবন সৃষ্টির আধার, তারই প্রতিফলনস্বরূপ মন্দিরগাত্রের মধ্যবর্তী প্যানেল জুড়ে মিথুনদৃশ্য খোদিত। কিন্তু সেসবই মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে। ভিতরে এরকম কোনও ভাস্কর্য নেই। সেখানে দেবদেবীর মূর্তি, বিভিন্ন আখ্যানের দৃশ্যাবলি, দেবনাগরী হরফে দেবতার বন্দনা ও সর্ব-অভ্যন্তরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বাইরের জাগতিক কামনা-বাসনা পরিসমাপ্তির শেষে বিগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণই জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু কামনা যতক্ষণ জাগ্রত আছে, মোক্ষলাভ ততক্ষণ সম্ভব নয়। বাসনার নিবৃত্তি ঘটলে তবেই আসবে মোক্ষ। এটাই খাজুরাহের মর্মকথা, এটাই তার দর্শন।

খাজুরাহর অসীম সৌন্দর্য আর রহস্যের এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে নিমেষে কেটে গেল দুটো দিন। যা দেখলাম, তার চেয়ে না দেখাই রয়ে গেল অনেক বেশি। বেশ বুঝতে পারলাম, আবারও ফিরে আসতে হবে এখানে, পাথর-কাব্যে প্রতিফলিত ভারতকথার খোঁজে।

### প্রয়োজনীয় তথ্য

• কলকাতা থেকে ট্রেনে অথবা প্লেনে খাজুরাহ যাওয়া যায়। খাজুরাহতে ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট আছে। মধ্যপ্রদেশের সব বড় শহরের সঙ্গেও খাজুরাহ সড়কপথে যুক্ত। • গ্রীষ্মকাল ছাড়া যেকোনও সময়ে খাজুরাহ যাওয়া যায়। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল হয় এখানে। • থাকার জন্য বিভিন্ন দামের এবং মানের অনেক হোটেল আছে খাজুরাহতে। • প্লাস্টিক সহ সব ধরনের বর্জ্য ফেলা এবং মন্দিরের দেওয়াল স্পর্শ বা কোনওরকম ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। • হাতে সময় থাকলে খাজুরাহের কাছাকাছি শিবসাগর লেক, রানে ফলস, পান্না রিজার্ভ ফরেস্ট ইত্যাদি দেখে নেওয়া যায় এক যাত্রাতেই।

*ছবি: লেখক*

# কিয়োটা থেকে বাকু কেউ কথা রাখেনি!

মৃণালকান্তি দাস

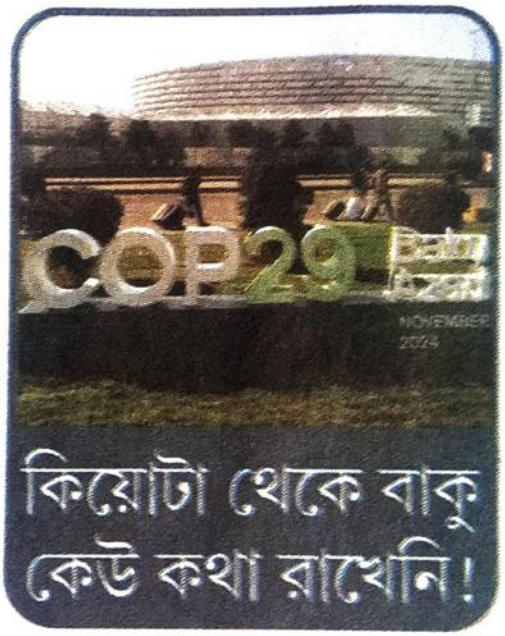


'আপনি যে শব্দটি শুনতে পাচ্ছেন, তা হল ঘড়ির টিকিং। আমরা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করার চূড়ান্ত কাউন্টডাউনে রয়েছি। সময় আমাদের পক্ষে নয়।' আজারবাইজানের বাকুতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জলবায়ু সম্মেলনে এমনই উদ্বেগের কথা শুনিয়েছেন আন্তোনিও গুতেইরেস।

অথচ, এবারের সম্মেলনের জন্য যে দেশকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেই আজারবাইজানের অর্থবলের উৎস অঢেল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। সম্মেলনের আনাচকানাচে এই বৈপরীত্য পরিহাসের মতো ঝুলে ছিল আরও এই কারণে যে—জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে এই দেশের সরকার কিছুদিন আগেও তেমন কোনও গরজ দেখায়নি। তাহলে কেন আজারবাইজানকে জলবায়ু সম্মেলনের আসর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল? স্থানীয় পরিবেশকর্মীদের কথায়, 'ক্লাসের দুর্বিনীতদের মনিটরের দায়িত্ব দিয়ে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন, গতবার ছিল দুবাই, এবার বাকু। দুই দেশের অর্থনীতিই জীবাশ্ম জ্বালানির উপর ভেসে রয়েছে।' ফলে বাকু সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় বাকুর জলবায়ু সম্মেলনের পরতে পরতে মাখামাখি হয়েই ছিল। তার উপর আমেরিকায় ফের ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন হওয়া সেই সন্দেহের মূল হলেও, বাকুতে একের পর এক বিশ্ব নেতার অনুপস্থিতির খবরও হতাশা ছড়িয়েছে।

অথচ, বিশ্বের ১৩০টি দেশের ১ হাজার ৯০০ নাগরিক সমাজ সংগঠনের ফোরাম 'ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক'—এর কর্তা তাসমিন ইসপ তাঁদের প্রত্যাশার কথা দৃপ্তভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে বছরে এক নাগাড়ে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে। নাহলে গরিব দেশ তো মরেই রয়েছে, বড়লোক দেশগুলোরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অনিবার্য। দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে তাপমান তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। দেশে দেশে তার ঝলক দৃশ্যমান। কিন্তু কে বোঝাবে কাকে? কে দেবে এই বিপুল অর্থ? উত্তর মেলেনি এবারও!

২০০১ সালে যখন বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসে শিল্পোন্নত দেশগুলির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল, জাপানে অনুষ্ঠিত সেই 'কিয়োটা প্রটোকল'কে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। আর ২০২৪ সালে, আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন, 'কপ ২৯' শুরুর প্রাক্কালে মার্কিন মুলুকের পালাবদল হুট করে আট বছর আগের স্মৃতি ফিরে এসেছে। সংশয় জেগেছে প্রবল, তবে কি জলবায়ু পরিবর্তনের এই অর্জন নতুন করে পড়তে চলেছে বিশ বাঁও জলে? সংশয়ের কারণ, আট বছর আগে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। ২০১৬ সালের নভেম্বরে, মরক্কোর মারাকেশে বসেছিল বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের খবর দিয়ে। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। কারণ, নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বারবার জলবায়ু পরিবর্তন ও সেই সম্পর্কিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জলবায়ু আন্দোলন এক 'ব্যয়বহুল ধাপ্পাবাজি'। যুক্তিহীন, অহেতুক এবং সেটা 'চীনের স্বার্থে চীনাদের তৈরি'। এসব মন্তব্য ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর ঘোষণা। বলেছিলেন, প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকা বেরিয়ে আসবে। সেই ঘোষণা মারাকেশে সমবেত আন্দোলনকর্মীদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবত তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। কে জানে, তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দ্বিতীয়বারের মতো করবেন কি না।

'ড্রিল বেবি ড্রিল' যাঁর মন্ত্র, প্রচারের সময় বারাবার যিনি জীবাশ্ম জ্বালানিতে বাড়তি লগ্নির কথা শুনিয়েছেন, জলবায়ু নিয়ে যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও বেশি করে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছেন, সেই ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার রাজত্বে উল্টো পথে হাঁটবেন, তা ভাবা বাতুলতা। বিশ্বব্যাপী সবারই প্রথম নজর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কারণ, তা কম খরচে করা যায়। ট্রাম্প আরও বেশি গ্যাস ও তেল উৎপাদনে কূপ খননের নির্দেশ দিলে অন্যত্র তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আমেরিকানদের আরও বেশি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যিনি ভোটে জিতলেন, আরও বেশি করে গ্যাস ও তেলকূপ খনন না করলে বেশি কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত তাঁর পক্ষে করা কঠিন। অর্থাৎ কেঁচে গণ্ডূষ। পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের হতাশা বাড়িয়ে বাকুতে 'কপ ২৯'—এর আসরে নতুন করে ট্রাম্পের ছায়া দীর্ঘায়িত হয়েছে। আবহাওয়া নিয়ে ছেলেখেলা করার যে বিপজ্জনক রাস্তায় বিশ্বের একাধিক দেশ হাঁটছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সেই রাস্তা একরৈখিক। এই মুহূর্তে প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতির পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আসলে বরাবর প্রকৃতির প্রতিস্পর্ধী হতে চেয়েছে মানুষ। কিন্তু প্রতিস্পর্ধী বা বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে সে যদি প্রকৃতির বন্ধু হতে পারত, তা হলে হয়তো জলবায়ু সঙ্কট অতিক্রম করে ভবিষ্যতের জন্য এক অন্য পৃথিবী রেখে যেত পারত। এই সহজ সরল কথা ট্রাম্পকে কে বোঝাবে?

# ফেরা

মৃত্তিকা মাইতি

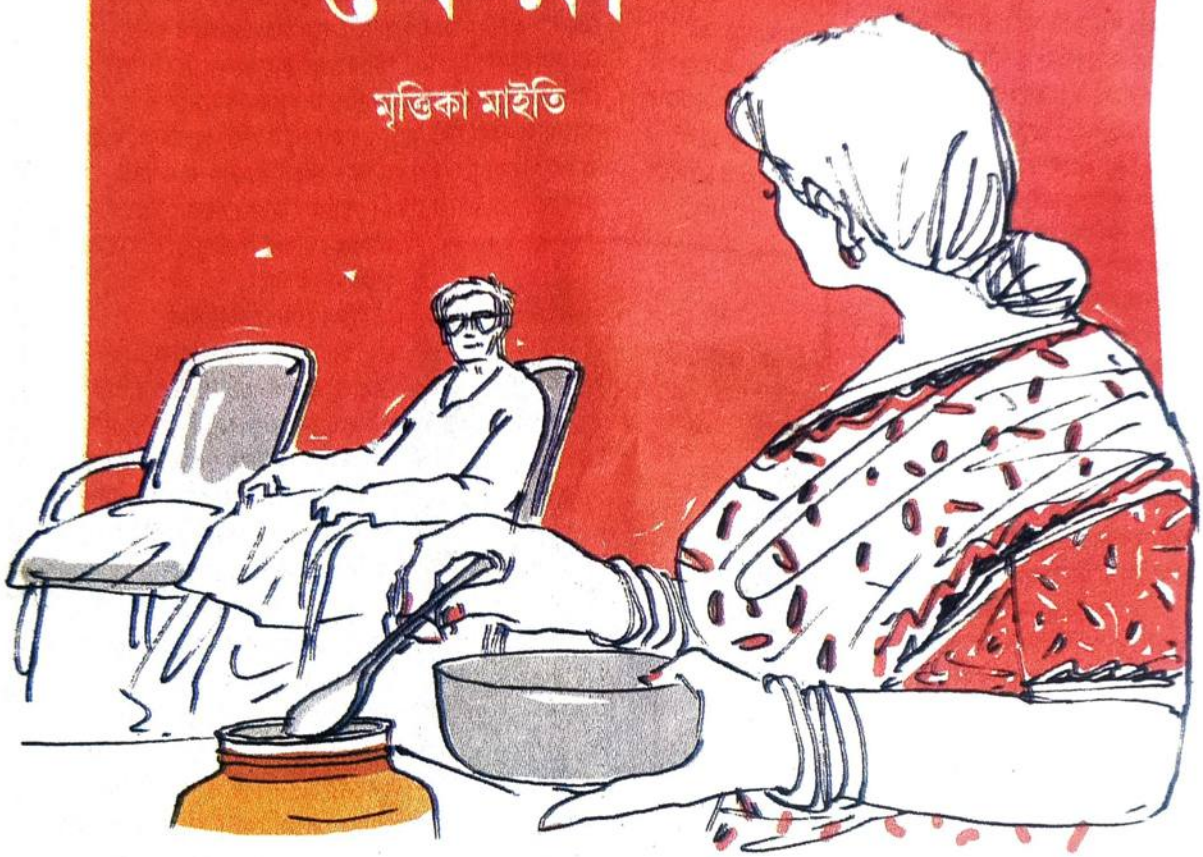

মঞ্জুলা বরাবরের জন্য গ্রামে ফিরে যাবে শুনে অমলেন্দু রায় চুপ করে গেলেন। রোজের মতো বাজারে গিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়াও করছেন, সারাদিন আরও যা যা করেন সবই করছেন কিন্তু কোনও কথা বলছেন না।

মঞ্জুলা বুঝতে পারে সবই। কিন্তু সেও নিরুপায়। নিজের সংসারের প্রয়োজনে একদিন তাকে চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। জীবনের প্রায় তেইশ বছর পার করে ফেলেছে অন্যের ঘর সামলাতে। বাবুদের বাড়ি বাসন মাজা, ঘর মোছা, রান্না করা, কারও আবার বাচ্চা সামলানো। একটা সংসারে যত রকমের কাজ হয়। অত করেও কখনও কারও ঘরের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। তারা মুখে যতই বলুক 'পরিবারের একজন', বাইরে পরিচয় দেওয়ার সময় বলতে হয়, 'আমাদের বাড়ির কাজের লোক।'

কথাটা শুনে বুকের মধ্যে মোচড় দিত। তারপর ভাবত, কীসের কষ্ট? গতর খাটায়, বদলে পয়সা নেয়। নিজের মনে তো জানে, সেও কারও বউ, কারও মা, সত্যিকারের একটা সংসার তারও আছে।

মঞ্জুলার বর পঞ্চা কর চাষবাস করত। অন্যের জমিতে ধানকাটার কাজও করত। ফাঁকে ফাঁকে ছিল গাছ ঝুড়ার কাজ। গ্রামে কেউ কোনও গাছের ডাল কাটবে কী তেঁতুল পাড়বে— ডাক পড়ত পঞ্চার। নারকেল গাছ ঝুড়ার কাজ তো ছিল বাঁধা। সেই গাছ থেকেই একদিন পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় চোট পেল। ডাক্তার বলে দিল, গাছে কোনওদিনই আর উঠতে পারবে না। ভারী কাজ করাও বারণ।

ছোট ছোট দুই মেয়ে আর কোলের ছেলেকে ফেলে মঞ্জুলাকে পাড়ি দিতে হয়েছিল অজানা শহরে। তখন মঞ্জুলার বয়স এই সাতাশ-আঠাশ হবে। গ্রাম, ঘর, স্বামী-সন্তানের দুঃখ ভুলতে সন্ধে থেকে রাত কাজে ব্যস্ত রাখত নিজেকে। ছ'মাস কী বছরে একবার বাড়ি যেত। দিন সাতেক থেকে আবারও সেই নাড়ি ছেঁড়ার যন্ত্রণা নিয়ে চড়ে বসতে হতো বাসে।

বছর দশেক এর বাড়ি তার বাড়িতে কাটানোর পরে শেষে এই অমলেন্দু রায়ের বাড়ি কাজের খোঁজ পেয়েছিল মঞ্জুলা। চব্বিশ ঘণ্টার লোক চাই। বুড়োর দেখাশোনা করতে হবে আর ঘর সামলানো। বুড়ো একা থাকে। সরকারি অফিসে চাকরি করত। বছর দুয়েক অবসর নিয়েছে। তার মধ্যে আবার তার বউও মারা গিয়েছে। এক ছেলে। বাপের সঙ্গে বনিবনা নেই। বউ, বাচ্চা নিয়ে অন্য জায়গায় থাকে। কখনও-সখনও এসে বাপের খোঁজ খবর নিয়ে যায়। একা মানুষের কাজ কম। রাজি হয়ে গিয়েছিল মঞ্জুলা।

সেই থেকে টানা সাড়ে বারো বছর এ বাড়িতে কাটিয়ে ফেলল মঞ্জুলা। এখানে থাকতে থাকতেই দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছেলেটাও এখন খাটুনে হয়েছে। তারও এবার বিয়ে দিতে হবে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বাপ-ছেলের রাঁধা, খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে খুব। মঞ্জুলা তাই বরের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে গ্রামে ফিরে যাবে। নিজেদের যে ক'কাঠা জমিজিরেত আছে তাতে করেকম্মে খাবে। কয়েকটা ছাগল আর গণ্ডাখানেক হাঁস, মুরগি পুষলে সংসার খরচও চলে যাবে। তারপর ছেলেটা তো আছেই। অনেক ভেবেচিন্তেই গ্রামে ফেরার কথাটা অমলেন্দুকে জানিয়েছে মঞ্জুলা।

রাতে খেতে বসে অমলেন্দু রায় সারাদিনের মৌনব্রত ভাঙেন। বলেন, 'মঞ্জুলা, আমি যদি তোমার সঙ্গে তোমাদের গ্রামে যেতে চাই—তুমি কি নিয়ে যাবে আমায়?'

কথা শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল মঞ্জুলা। ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না। তাই চুপ করে ছিল।

অমলেন্দু রায় আবারও বলেন, 'কী মঞ্জুলা, নিয়ে যাবে আমায়? তোমাদের জায়গায়?'

মঞ্জুলার চমক কাটে। সে বলে, 'কেন নিয়ে যাব না। আমি নিজেই তো কতবার বলেছি। চলুন না আমাদের ওখানে। কিন্তু ওই আগেও যা বলেছি—কিছু সমস্যা হবে আপনার। ভালো বাথরুম নেই, তাছাড়া পুকুরে চান করতে হবে। আমাদের বাড়িটাও পাকা নয়, মাটির। তাতে আবার খড়ের ছাউনি। তবু, ক'দিনের জন্য খারাপ লাগবে বলে মনে হয় না।'

অমলেন্দু রায় শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলেন, 'তোমরা যখন থাকতে পার, আমি কেন পারব না মঞ্জুলা। সমস্যা সেটা নয়। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারনি। ক'টা দিনের জন্য নয়। আমি বরাবরের কথা বলছি। নিয়ে যাবে এই বুড়ো লোকটাকে?'

মঞ্জুলা কথাটা বোঝার চেষ্টাতেই ছিল। অমলেন্দু তখন যেন নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো করে বলতে থাকেন, 'রিটায়ারমেন্টের সময় প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে যা পেয়েছি আর ব্যাঙ্কে যা জমেছে তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে। তা না হলে এই দোতলা বাড়িটা তো আছেই। ভেবেছিলাম ছেলে, বউমা, নাতিকে নিয়ে সবাই একসঙ্গে থাকব। তাই এই বাড়ি বানানো। কিন্তু কোথায় কী!'

গ্রামে গিয়েও মঞ্জুলা মন থেকে সরাতে পারত না লোকটাকে। কী খাচ্ছে? কী পরছে? শরীর খারাপ করল না তো? কয়েকবার তো অসুখে ভুগেছেন। তখন অবশ্য মঞ্জুলা কলকাতাতেই। সারিয়ে তুলেছে অমলেন্দুকে। সেই সময়ে ছেলে-বউমা এসে খোঁজখবর করেছে। তবে থাকেনি একদিনও। ছেলে রূপকের বউ ইন্দ্রাণী বলেছে, 'তুমি আছ তো, আমরা নিশ্চিন্ত। বাবা তো এখন তোমার সঙ্গে ভালোই থাকেন।' কথাটায় যে খোঁচা থাকত তা মঞ্জুলার গায়ে ফুটত। যদিও সে চুপ করেই থেকেছে। একটা মানুষের ভার তার ওপর। আবার তার ভারও তো নিয়েছে লোকটা। মঞ্জুলার শরীর খারাপ হওয়ায় অমলেন্দু তাকে নিয়ে গিয়েছেন বড় ডাক্তারের কাছে। তার সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর রেখেছেন। তবে মানুষটা আগের থেকে আরও বুড়িয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় একা কী যে করবে। কাউকে যে রাখবে তারও ভরসা নেই। সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। কখনও-সখনও অমলেন্দুর দূর সম্পর্কের এক ভাই আসেন। খোঁজ নেন। গল্প করেন। অমলেন্দুর ছেলে আর বউমার নামে গোটাকতক নিন্দেমন্দও করেন। অমলেন্দু তখন বলেন, 'বাদ দে। ওদের আমাকে দরকার নেই। আমারও ওদের দরকার নেই।'

মঞ্জুলা বলে, 'আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন তো। বয়স হয়েছে, এখন হয়তো তারা আপনাকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাইতে পারে।'

এবার অমলেন্দুর কথায় বিরক্তি ফুটে ওঠে— 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মঞ্জুলা! তুমি তো এখন সবই জানো। সে আমাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে বলে তোমার মনে হয়? এখানেই তো থাকতে পারত ওরা। কিন্তু তাতে নাকি প্রাইভেসি থাকে না। ড্রিঙ্ক, পার্টি, হুল্লোড়—এসব তো এখানে করা যেত না। ফরেন ট্যুরে বুড়ো বাবাকে তো নিয়ে যাওয়া যেত না। ওদের চাই ফ্রিডম উইদাউট রেসপন্সেবিলিটি। স্বাধীনতা চাইবে, দায়িত্ব নেবে না।' টেবিল থেকে উঠে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন অমলেন্দু।

এ বাড়িতে আসার মাস দুয়েক পরেই অমলেন্দু বলেছিলেন মঞ্জুলাকে তার সঙ্গেই টেবিলে বসে খেতে হবে। আলাদা কোণায় বসে খাওয়া চলবে না। গোড়ার দিকে অসোয়াস্তি হতো মঞ্জুলার। তারপর তারও ভালো লাগতে শুরু করে। সুখ-দুঃখের কত গল্প যে করেছেন অমলেন্দু তখন। মঞ্জুলাও তো বলেছে কত কথা। সাড়ে বারো বছর কি এমনি এমনি পেরিয়ে যায়!

সেই খাওয়ার টেবিলে বসে ছটফট করতে থাকে মঞ্জুলা। এত বড় একটা সিদ্ধান্ত সে একা নেবে কী করে? বরকে না জানিয়ে? তার কী মত সেটাও তো জানা দরকার।

## দুই

পঞ্চা প্রথমটায় থমকে গিয়েছিল সব শুনে। এইরকম একটা ব্যাপারে কী বলা উচিত তার জানা নেই। এতদিন বউ যার বাড়িতে কাজ করেছে সেই মালিক এসে থাকবে তাদের বাড়ি! তাও কি সম্ভব? এখানে কি কোনও শহুরে লোক এসে থাকতে পারবে? তাছাড়া আসতেই বা চাইছে কেন সব ছেড়ে? নাকি তার বউকে ছাড়তে পারছে না? যদি তা-ই হয় তাহলে তাকে থাকতে দেওয়াই বা হবে কেন? না, বয়স তো সত্তর পার। এখন আর কী-ই বা হবে? আবার এমনও তো হতে পারে যে ওসব কিছুই নয়। ছেলে আর ছেলের বউ তাকে দূরে ঠেলে রেখেছে। সেও পালিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু গ্রামের লোক তো এখন শহরের দিকে দৌড়চ্ছে। আর নয়তো যারা আছে তারা ভাবছে কবে শহর হয়ে উঠবে গ্রাম। বাইরে বিশেষ বেরত না পারলেও ঘরে বসেও বুঝতে পারে পঞ্চা। এ লোকটা কি উল্টো দিকে দৌড় লাগাতে চায় নাকি!

নিজের কোনও ফোন নেই। অমলেন্দুর ফোন থেকেই বাড়িতে ছেলের মোবাইলে ফোন করেছিল মঞ্জুলা। এখন সব বাড়িতেই একটা-দুটো ফোন আছে। কথা বলার কত সুবিধে হয়ে গিয়েছে। ছেলে বাবার কানে ফোন ঠেকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে

গিয়েছিল। তবে মঞ্জুলার কথার জবাব দিতে পারছিল না পঞ্চা। বেশিক্ষণ কিছু নিয়ে মাথাকে ব্যস্ত রাখতে পারে না সে। ভাবনা গুলিয়ে যায়। তবু সে বলল, 'তার ছেলে, ছেলে-বউ কী কয়?'

মঞ্জুলা বলেছিল অমলেন্দুকে, 'আপনার ছেলে আর বউমাকে জানানো তারা পরে শুনলে রাগ করবে। এমন করে আপনি যেতে পারবেন নাকি?'

অমলেন্দু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'না মঞ্জুলা। তাদের আমি জানাব না। পরে কী হবে সে দেখা যাবে। আমায় নিয়ে যাওয়ায় তোমার যদি অসুবিধে থাকে, তোমার বাড়ির লোক যদি না করে, তাহলে বলে দাও। আমি যেতে চাইব না।'

মঞ্জুলা তার বরকে বলল, 'তাদের কয়নি মনে হয়।'

পঞ্চা আরও ভড়কে গিয়ে বলল, 'তারা যদি কয় তুমি তাদের বুড়ো বাপকে চুরি করে লিয়া গেছ!'

হেসে ফেলল মঞ্জুলা, 'এত বড় একটা লোককে চুরি করা যায় নাকি! তোমার যেমন কথা। তুমি কী কইছ কয়।'

পঞ্চা বলল, 'তুমি যা ভালো বুঝ কর। আমানকের যদি শাকভাত জুটে আর এক লোকেরও জুটে যাবে। তবে দেখ, শহুরে মানুষ, ক'দিন রইতে পারে। তারই হয়তো ভালো লাগলানি। নিজেই ফিরে যেতে চাইল।'

'আমারও তা-ই মনে হয়। পারে কুনো দিন!'

## তিন

দিন পনেরো কেটে গিয়েছে। অমলেন্দুর বেশ ভালোই লাগছিল গ্রাম। গাছপালা, পুকুর, মাঠঘাট, ধানিজমি, তাল গাছের সারি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। খোলা হাওয়ায় কী প্রাণ! মানুষজন সকলে সকলের বাড়িতে যায়, খবরাখবর নেয়, গল্প করে। অমলেন্দু আসার পর আশপাশের কয়েকজন এসেছিল কথা বলতে। অমলেন্দুকে রোজ বিকেলে মঞ্জুলা নয়তো তার ছেলে রাজু বেড়াতে নিয়ে যায়। রাজু তাকে বলেছে, 'জ্যাঠা, তোমায় একদিন রসুলপুরের নদী দেখাতে নিয়ে যাব। রাসের মেলা হোক, সেখানেও নিয়ে যাব।'

খানিকটা দূরে একটা খাল আছে। তার পাশে উঁচু বাঁধের মতো। দু'ধারে আকাশমণি গাছের সারি। সেখানে হাঁটতে বড় ভালো লাগে। সারাদিনে বেশ কয়েকটা ওষুধ খেতে হয় অমলেন্দুকে। দু'মাসের মতো সঙ্গে এনেছিলেন। মঞ্জুলার ছেলে বলেছে পরে আবার সে এনে দেবে। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠে মাটিতে, ঘাসে পা রাখার পরে পরেই রোজ অমলেন্দুর মনে হয়, ওষুধ ফুরিয়ে গেলেও কিছু যাবে-আসবে না।

খাওয়া-দাওয়াও বদলে গিয়েছে অমলেন্দুর। মাংস তো আগেই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এখানে মাছটাই খাচ্ছেন। একদিন আমসি দিয়ে শোল মাছের টক হল। তরিবত করে খেলেন অমলেন্দু। তবে বেশিটাই নিরামিষ। আশপাশ থেকে শাকপাতা, কচুর লতি এনে দুটো পদ বেশিই রাঁধে মঞ্জুলা। একদিন তল্লিপাতা, আলু, বেগুন আর নোনা মাছের মাথা ভেঙে দিয়ে চচ্চড়ি করেছিল। অমলেন্দু বুঝতে পারেন, কলকাতায় এসব হাতে আসত না মঞ্জুলার। এখানে তিনি ওদের স্বভাবের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন।

এখনও মাটির উনুনেই রান্না হয় এ বাড়িতে। অমলেন্দু বলেছেন, 'এবার গ্যাসের ব্যবস্থা দেখ মঞ্জুলা।' বলতে গিয়ে যদিও মনে হয়েছিল, খাবারের স্বাদ বদলে যাবে তাতে।

এ বাড়িতে দুটো ঘর। একটা অমলেন্দুর জন্য ছেড়ে দিয়েছে ওরা। খাট আছে সেখানে। মাঝে মাঝে মাটির দাওয়ায় বসে মঞ্জুলার বরের সঙ্গে গল্পগাছা করেন তিনি। সে তখন মাছ ধরার দোমেলিয়া জাল বোনে। এখানে কলঘর বলে আলাদা করে কিছু ছিল না। অমলেন্দুর কথায় টিন দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা হয়েছে। পায়খানার প্যান বসানো জায়গাটা চট দিয়ে ঘেরা ছিল। সেটাও টিনের আড়ালে। দুটোরই মাথায় ছাউনি বসেছে। পঞ্চার সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলেছেন অমলেন্দু। জমি কিনে ছোট একটা বাড়ি বানাবেন এখানে। মাটির বাড়ি। তাই শুনে পঞ্চা হেসেছিল। গ্রামের লোক তো এখন পাকা বাড়ির দিকে ঝুঁকছে। এ লোকটা ফের উল্টো কথা বলছে। অমলেন্দু পঞ্চার হাসি সরিয়ে দিয়েছেন। যা ভাবছেন তেমনই করতে চান। তাতে মঞ্জুলাদেরও অসুবিধেয় ফেলা হবে না, আবার ওদের কাছাকাছিও থাকা হবে। অমলেন্দু যেন নতুন করে বাঁচার একটা দিক পেয়েছেন।

গাঁ-ঘরে কারও গাছে ফলপাকড় পাকলে যেখানে লোকমুখে সকলে জেনে যায় সেখানে ছাতনাবাড়ি গ্রামে এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে আর সেটা কেউ টের পাবে না তা কি হয়! গোটা গ্রামে চাউর হয়ে গিয়েছে, মঞ্জুলা কলকাতা ছেড়ে ফিরেছে। তবে ফিরেছে একেবারে তার বাবুকে সঙ্গে করে। সেই বাবু তাদের বাড়িতে জমিয়ে বসেছে। এখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার বহর কী! দু'বেলা বাজার আসছে। মাছ, মাংস, ডিম ছাড়া নাকি রান্নাই হয় না। আগে যাদের একশো সর্ষের তেলে এক হাটবার থেকে আর এক হাটবার পেরিয়ে যেত, তাদের রান্নার ঝাঁজে পাড়াপড়শির টেকা দায়। কেউ দেখা করতে গেলে তাকে নাকি চা যাচে।

'হবেনি? যত ঠাটবাট তো ওই বাবুর টাকায়।'

'আরে বাবুর মাউগ তো মরে গেছে, আর পঞ্চা তো রইত এখানে। কলকাতায় দু'জনে কী করেছে কেউ দেখতে গেছে!'

'কতদিন ওই মধুর আঠা টেকে দেখা যাউ। টাকা ফুরলে পিরিতির আঠাও শুকি যাবে।'

'তার আগে সব ঠিক গুছিয়ে লিবে পঞ্চার মাউগ।'

এসব হল মেয়ে মহলের কথা। তাদের ভালোমন্দ দেখার ভার যাদের ওপর সেই পুরুষরাও চোখ বন্ধ করে নেই। তাদের নজরেও কিছুই এড়ায় না।

গাঁয়ের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিদ্যুৎ কর। পাড়ার মনসা পুজো, দোল, রাস উৎসবের পান্ডা সে। টাকা-পয়সার হিসেব সামলায় সে-ই। গ্রামে তার মোড়লগিরি চলে। মাঝে মাঝেই কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছিল বিদ্যুতের কাছে। যেমন পুজো কমিটির একজন এসে হাজির, 'দাদা, এর তো একটা বিহিত করা দরকার। দায়িত্বে রয়া তুমি যদি শক্ত হাতে সমাজের হাল নেই ধর, কাল তো যে কেউ পঞ্চার মাউগের মতো সাহস পেয়ে যাবে।'

উস্কে দেওয়ার জন্য সেই শিবা আরও বলল, 'স্মরণে আছে তো? সামনে রাস উৎসব। সাত-আট গাঁয়ের মানুষ খায়। ফান্ড জমা করার কথা ভাবতে হবে তো। ওদের রাসলীলায় রাশ টানো এবার একটু।'

পঞ্চায়েত মেম্বারের মাথা গরম করলে চলে না। তাকে সব দিক ভেবেচিন্তে, হিতাহিত মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার ওপর পঞ্চারা হচ্ছে তাদের জ্ঞাতি। বিদ্যুৎ বলল, 'হুড়ুমদুড়ুম করিয়া কাউকে তো শুধু শুধু বিচারে টেনে আনা যায়নি। তার জন্য প্রমাণ লাগে। দেখছি কী করা যায়।'

## চার

একটা চার চাকার গাড়ি ঢুকল গ্রামের পথে। খুব চমকের ব্যাপার নয়। তবে বাইরের গাড়ি বুঝতে পেরে বাচ্চা,

বুড়ো, মেয়ে, বউরা অনেকেই দেখতে চাইছিল কাদের বাড়ি যাচ্ছে। কাচ নামিয়ে একটা লোক তাদেরই একজনের কাছে জানতে চাইল, 'মঞ্জুলা করের বাড়ি কোনটা বলতে পারেন? হাজব্যান্ডের—স্বামীর নাম পঞ্চানন কর।' তখন ভিড়ের মানুষই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

গোটা গাঁয়ের মানুষের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে। মঞ্জুলার উনুন থেকে তরকারির কড়াই নেমেছে। সবে খাবার বাড়ছিল মঞ্জুলা। তখনই কানে এল অনেকের গলা। একটা হইচই পড়ে গিয়েছে তাদের উঠোনে। বেরিয়ে পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। অমলেন্দুর ছেলে-বউমা। গাড়ি দূরে রেখে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল মঞ্জুলা। 'দাদা-বউদি তোমরা! আসছ যে, ফোন করনি কেন? এসো এসো।'

বউমা কোনও কথা বলল না। ছেলের মুখ গম্ভীর। সে জানতে চাইল, 'বাবা কোথায় মঞ্জুলাদি? ক'দিন ধরে ফোন করছি। সুইচড অফ। বাড়ি গিয়ে দেখি তালা ঝুলছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইন্দ্রাণীই আমাকে বলল, দেখ, তোমার বাবাকে হয়তো মঞ্জুলাদি নিয়ে গিয়েছে তার দেশের বাড়ি।'

ফ্যাকাশে মুখে মঞ্জুলা বলল, 'আমি ওনাকে বলেছিলাম তোমাদের জানাতে। উনি কিছুতেই...। তোমরা ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'তোমার আধার কার্ডের একটা জেরক্স ছিল কবেকার। অনেক খুঁজে তারপর পেলাম। তা না হলে তো আসতেই পারতাম না এখানে। বাবাকে ডাক।'

গোটা পাড়ার মানুষ জমতে শুরু করেছে মঞ্জুলার উঠোনে। পেছনের লোক উঁকিঝুঁকি মেরে কথা শোনার চেষ্টা করছে। এরপরে হয়তো হুমড়ি খেয়ে গায়ে গায়ে পড়বে।

এর মধ্যে ঘরের ভেতর থেকে সকলে বেরিয়ে এসেছিল। অমলেন্দু ছেলে-বউমার দিকে দেখলেন, 'তোমরা এখানে কেন?'

রূপক বলল, 'তোমার খোঁজখবর না পেয়ে আমরা তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তুমি এরকম একটা কাজ কী করে করলে বল তো! রেসপন্সেবিলিটি বলে কিছু নেই?'

'রেসপন্সেবিলিটি নিয়ে তোমরা কথা বল না। কষ্ট করে এখানে আসার দরকার ছিল না। নাকি ভাবলে বাবার সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেল?'

'আমরা এখানে ঝামেলা চাই না বাবা। তুমি গাড়িতে ওঠ। আমরা এখনই রওনা দেব। চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

'তোমরা ফিরে যাও। আমি এখানে থাকব বলেই এসেছি।'

'কী চাইল্ডিশ কথাবার্তা বলছ! এখানে তুমি থাকতে পারবে? কোনটা তোমার নিজের জায়গা সেটা বোঝ। আমরা তোমাকে নিয়েই ফিরব।'

অমলেন্দু বুঝতে পারছিলেন কথা বাড়লে অশান্তি হতে পারে। এদের গ্রামের সকলে জড়ো হয়েছে। মঞ্জুলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার মুখ ছোট হয়ে গিয়েছে। অমলেন্দু তাকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। এই সময় পঞ্চা এগিয়ে এসে দাঁড়াল— 'মুখের ভাত ফেলে যেতে নেই। ওনার এখনও খাওয়া হয়নি। আপনারাও গরিবের ঘরে দুটো মুখে দিয়ে নিন। তারপর না হয়—।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'আমরা এখানে খেতে আসিনি। বাবাকে নিয়ে চলে যাব।'

রূপক বলল, 'বাবা চল। রাস্তার হোটেলে খেয়ে নিও।'

মঞ্জুলার মনের মধ্যে তোলপাড়। কিন্তু সে শুধু নিচু গলায় অমলেন্দুকে বলল, 'ওরা যখন নিতে এসেছে, আপনি ফিরে যান। আমি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি।' বলেই সে আর দাঁড়াল না। ঢুকে গেল ঘরে।

মঞ্জুলার ছেলে কোথা থেকে প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার এনে দিয়েছে। উঠোনের মাঝখানে বসে রয়েছে রূপক আর ইন্দ্রাণী।

অমলেন্দু ঘরে গেলেন। মঞ্জুলা স্যুটকেসে জামাকাপড় ভরছে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দিও মঞ্জুলা। আমার জন্য তোমাদের অনেক অপমান হয়ে গেল।'

মঞ্জুলা মুখ নিচু রেখেই বলল, 'ভালো থাকবেন আপনি।'

## পাঁচ

গাড়ি বেরিয়ে গেল। সেই অপেক্ষাটুকুই যেন ছিল। নানা জনে নানা রঙ্গতামাশার কথা নিয়ে পড়ল।

'শেষে এক বুড়াকে ভুলিয়া-ভালিয়া লিয়া এসছিল!'

'বুড়া হোক কী ছুঁড়া, আসলে তো পয়সা। এতদিনে অবশ্য পকেট ফাঁকা করি দিচ্ছে।'

'আমি হলে তো ও মুখ আর দেখাইথি নি। দড়ি-কলসি লিয়া—।'

এই সময়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল বিদ্যুৎ কর। তাকে দেখে সকলেই চুপ করে গেল। বিদ্যুৎ বলল, 'শোনো পঞ্চা, অনেকদিন থেকে তুমার বউয়ের নামে অনেক কথা কানে আসছিল। আইজ আর কোনও সাক্ষীসাবুদের দরকার নেই। গোটা পাড়া উপস্থিত আছে। আমরা একটা সমাজে বাস করি, তার একটা নিয়মকানুন আছে। আমাদের সকলকেই তা মানিয়ে চলতে হয়।'

'আমরা আবার কোন নিয়ম অমান্য করলি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পঞ্চা।

'সে তুমার পরিবারের কাছে জানি লিবে। এখন বিচারের রায় শুনি লাও। জ্ঞাতিদের সঙ্গে রইতে গেলে আর এক ক্ষুরে নখ কাটতে গেলে রাস উৎসবের ফান্ডে দশ হাজার টাকা জরিমানা ভরতে হবে। তুমি রাজি আছ? রাজি নেই রইলে জ্ঞাতি তুমাকে এক ঘরে করবে।'

পঞ্চা হাতজোড় করে ফেলল, 'বিনা অপরাধে এ কেমন সাজা? অত টাকা কোথায় পাবা?'

'এখন তুমাদের হাতে টাকা নেই, এ কথা কউ বিশ্বাস করবে পঞ্চা? পাঁচ দিনের সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে ক্লাবে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে।'

বিদ্যুৎ কর জানে, এই বিচারের বিপক্ষে যাবে এমন সাহস গ্রামে কারও নেই। সে পঞ্চাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দিল— 'এই চল, চল সবাই, গেরস্তের খাওয়াদাওয়া হয়নি। তানকের খেতে দাও।' ভিড় ফাঁকা করে সকলকে নিয়ে চলে গেল সে।

বেলা পড়ে আসছে। সূর্য ছাতনাবাড়ি গ্রামের মাঠের ওপারে তাল গাছের সারির আড়ালে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। আরও কত গাছে গাছে ফিরছে পাখির দল। কত রকমের সে ডাক তাদের। বাসা থেকে বেরনোর সময়েও এমনই ডেকেছিল। ফিরে যেতে যেতে চারপাশ নিঝুম করে দিয়ে যাচ্ছে তারা। পঞ্চা আর রাজু বাড়ির ভেতরে। খেতে বসেছে কি না কে জানে। মঞ্জুলার নড়াচড়া নেই। পাথর হয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে উঠোনে।

*অলঙ্করণ : সুব্রত মাজী*

# বিখ্যাত দুই অসম বিবাহ

কুমারেশ মণ্ডল

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

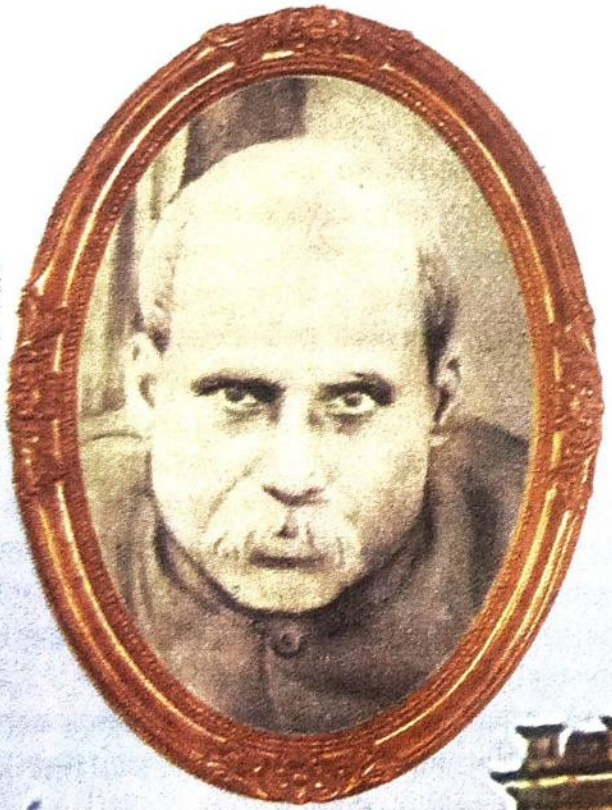

১৮৮৩ সালের ১৯ জুন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের কিছু পরে ২১ বছরের কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে বিয়ে হয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। কুলীনশ্রেষ্ঠ দ্বারকানাথের সঙ্গে কায়স্থ কন্যা কাদম্বিনীর প্রণয়ঘটিত বিবাহ।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাদম্বিনী মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিহারের ভাগলপুরের মোক্ষদা গার্লস হাইস্কুল থেকে কলকাতায় ওই বোর্ডিং স্কুলে পড়তে নিতে আসেন। নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ দ্বারকানাথের জন্ম ১৮৪৪ সালের ২০ এপ্রিল, বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুর পরগনার মাগুরখণ্ডা গ্রামে। কাদম্বিনীর জন্ম ১৮৬১ সালের ১৮ জুলাই বিহারের ভাগলপুরে। কুলীনশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম দ্বারকানাথের। বংশের অনেক পুরুষের চল্লিশের বেশি বিয়ে ও সে বিষয়ে উপঢৌকন নিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতে দেখেছেন। সমস্যা আক্রান্ত মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা বিষ খাওয়ানোটা অতি সাধারণ ঘটনা দেখে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করতে মনস্থ করেন। পরে তিনি সেই মানসিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বলেই আমরা প্রথম দু'জন ভারতীয় মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের একজন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম প্র্যাকটিসরত মহিলা চিকিৎসককে পেলাম।

দ্বারকানাথের আন্দোলনের ফলে মেয়েদের জন্য প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭৭ সালে এন্ট্রান্স প্রারম্ভিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। এরপর ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে মার্ক বি সাহেব এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব দিলেন, 'That the female



দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

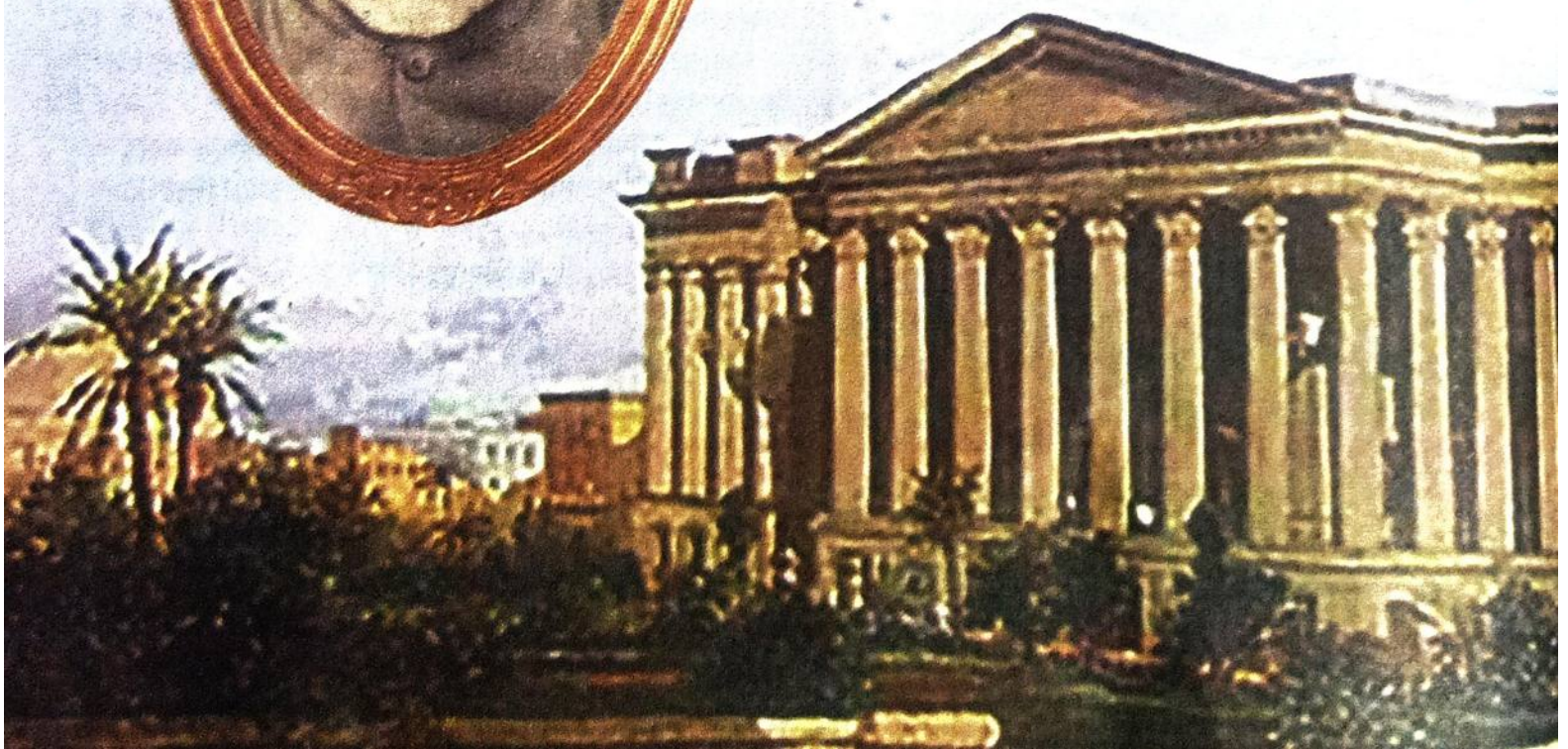

candidates be admitted to the University examination, subject to certain rules.' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখনও ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। ভারতবর্ষের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তো দূর অস্ত! এন্ট্রান্স পাশের পর লেডি লিটন কাদম্বিনী বসুকে সপ্রশংস পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেন। কাদম্বিনীকে স্বর্ণপদক ও বই উপহার দেন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ।

১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স পাশ তো হল। এবার তিনি পড়বেন কোথায়? আবার এগিয়ে এলেন তাঁর স্কুলের সেই লড়াকু প্রধান শিক্ষক, নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী পথিক, 'অবলা বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। একজন ছাত্রী ও একজন লেকচারার শশীভূষণ দত্তকে নিয়ে শুরু হল বেথুন কলেজ। ১৮৭৯ সালে বেথুন থেকে কাদম্বিনী ও ফ্রি চার্চ মিশন স্কুল থেকে চন্দ্রমুখী বসু এফএ পাশ করলেন। এঁদের দু'জনের জন্য বেথুন কলেজ দরজা খুলে দেয়। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে এঁরা দু'জনে এতদিনের জগদ্দল পাথর সরিয়ে ইতিহাস গড়ে সাফল্যের সঙ্গে বিএ পাশ করলেন। এই দুই ভারতীয় নারী সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেন। সমাবর্তন উৎসবে এঁদের ডিগ্রি নেওয়া দেখতে ভিড় রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়।

এরপর কাদম্বিনী ঠিক করলেন ডাক্তারি পড়বেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হয় না। আবার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লড়াইয়ে নামেন এবং অসাধ্য সাধন করেন। মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাজে হতাশ হয়ে তিনি প্রচারে নামেন। তিনি ডি পি আই-এ (Directorate of public Instruction) সরকারের কাছে জানতে চান, ডাক্তারি পড়তে চাওয়া যোগ্য মহিলাদের জন্য কী উত্তর আছে?

অবশেষে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাতিল হল। ১৮৮৩ সালের ২৯ জুন কাদম্বিনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন।

এই সময়ে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী, কাদম্বিনী তাঁর শিক্ষাজীবনের লড়াকু সঙ্গী দ্বারকানাথকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করলেন। দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনীর বিয়ে হল। নিজের যোগ্যতা ও মেধার সঙ্গে সাফল্যের জন্য দ্বারকানাথের অকুণ্ঠ সহযোগিতাকেও স্বীকৃতি দিলেন। দ্বারকানাথের কাজ কাদম্বিনীর কিশোরী মনে গভীর প্রভাব ফেলে। একে অন্যের পরিপূরক, ভাবনার সমাপতন ঘটল। ব্যক্তিত্বের মুগ্ধতায় বোধকরি প্রণয় জন্মাল। ডাক্তার হতে যাওয়া কাদম্বিনী এ কোন দ্বারকানাথকে বিয়ে করলেন! যে উদারমনস্ক মানুষ নারী স্বাধীনতা বিষয়ে কেবল বুলি না আউড়ে নিজে সেই আদর্শে অটল থাকলেন। এ সেই দ্বারকানাথ যিনি অল্প বয়সেই জেনেছিলেন কুলীন কন্যাকে আত্মীয়রা বিষ প্রয়োগের পর হত্যা করে কলেরার দোহাই দিত! জেনেছিলেন কুল হারানোর ভয়ে কুলীন কন্যাকে হয় অবিবাহিত জীবন, নয় সতীন নিয়ে ঘর, নয় অতিবৃদ্ধের কাছে যেতে হতো! ইনি সেই মানুষ যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কুলীন কন্যা উদ্ধার, অপহরণের মামলা, পুলিসি ঝামেলা সব সহ্য করে। নারী স্বাধীনতায় দরদি, নারীশিক্ষা বিস্তারে অনমনীয়, লড়াকু এই আদর্শ মানুষকে লড়াকু কাদম্বিনী বরণ করলেন। চা-কুলিদের জন্য লড়াকু দ্বারকানাথকে নিয়ে লেখা, 'আসামের চা-কুলি ও দ্বারকানাথ' বইতে অমর দত্ত এ বিষয়ে লিখেছেন, 'কাদম্বিনী বসু কর্তৃক দ্বারকানাথকে বিবাহের জন্য নির্বাচন নারীজাতির হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক হবে না।'

৩৯ বছরের বিপত্নীক পাত্র ও ২১ বছরের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রীর এই অসমবয়সি, জাতপাতের প্রশ্নে ভিন্ন বর্ণের এই বিয়ে রক্ষণশীল সমাজ ভালোভাবে নিতে পারেনি। বিশেষত কাদম্বিনী ছিলেন খুবই সুন্দরী ও শিক্ষিতা। নানা মানুষের অসূয়া ছিল। তাদের হয়ে 'Rayes and Ryot' পত্রিকা সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'Girls now a days are very obstinate' আবার এই শম্ভুচন্দ্রই নববধূ কাদম্বিনীর রূপের প্রশংসা করে লেখেন, 'She was phantom of delight When first she gleaned upon my sight, A lovely apparition sent To be a moment's ornament Her eyes as stare of Twilight fair.'

এই বিয়েতে ব্রাহ্ম সমাজে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। দ্বারকানাথের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিমন্ত্রিত হয়েও যোগ দেননি। এঁরা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁর দার্শনিক গুরু অক্ষয়কুমার দত্ত, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, দেবীপ্রসাদ বসু প্রমুখ। এমন বিতর্কিত সময়েও কয়েকজন বন্ধু পাশে ছিলেন। দুর্গামোহন দাশ, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় অতিথি। ১৮৮৩ সালে অ্যাক্ট ১১১, ১৮৭২ অনুযায়ী ব্রাহ্ম

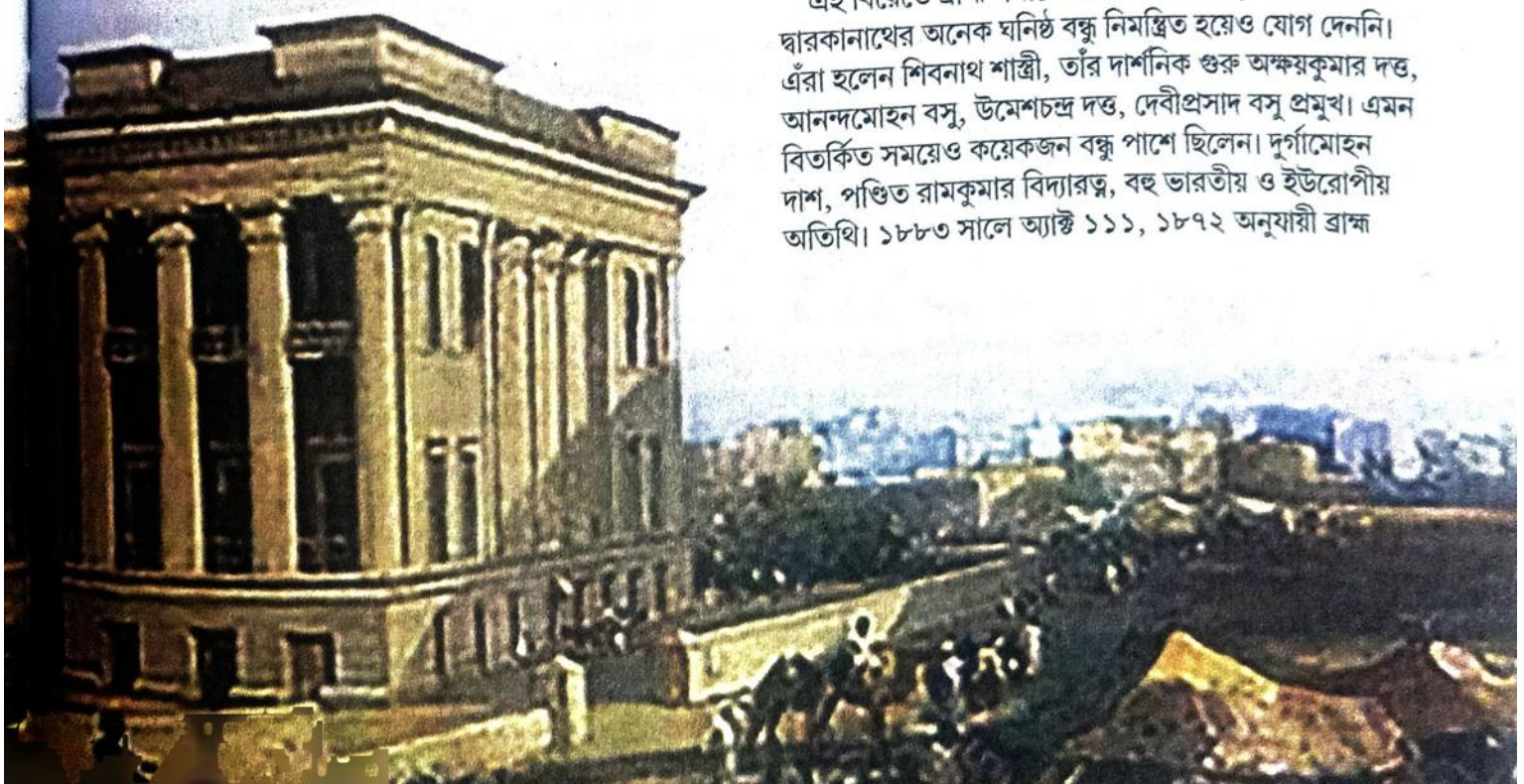

পদ্ধতিতে বিয়েটি সম্পন্ন করেন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন। যে কোনও ব্রাহ্ম বিয়ের খবর ছাপা হওয়া কাগজ 'বামাবোধিনী' পত্রিকা এ বিয়ের খবর ছাপল না। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কোনও মতে নামমাত্র দু'লাইন ছাপা হল। একই সঙ্গে গ্র্যাজুয়েট হওয়া চন্দ্রমুখী বসুকে সম্মান জানালেও কাদম্বিনী সম্পর্কে বিদ্যাসাগর আগাগোড়াই নীরব ছিলেন। এই বিয়ে ও কাদম্বরীর ডাক্তারি পড়া সমাজ মোটেই সহজভাবে নিতে পারেনি। ক্ষুব্ধ সমাজ প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়।

'বঙ্গবাসী' কাগজের সম্পাদক কাদম্বিনীকে তাচ্ছিল্য করে একটি কার্টুন প্রকাশ করেন। সেখানে দেখানো হয় কাদম্বিনী তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে নাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কার্টুনের নীচে কাদম্বিনীকে উদ্দেশ্য করে নানা কুরুচিকর মন্তব্য লেখা হয়। তাঁকে চরিত্রহীন বলা হয়। এই দম্পতি তার প্রতিবাদ করেন। কাগজের সম্পাদক মহেশচন্দ্র পাল আদালতে অভিযুক্ত হন। বিচারে মহেশবাবুর ছ'মাসের জেল ও একশত টাকা জরিমানা হয়। সে সমস্ত দিনে ক্ষমতাশালী কাগজের পুরুষ সম্পাদকের বিরুদ্ধে এ কাজ করা কঠিন ছিল। মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলনে, কাণ্ডারী দ্বারকানাথ, সহায়ক কাদম্বরী। বেথুনে এন্ট্রান্স, এফএ ক্লাস, দু'জনই সহযোদ্ধা।

## ॥ দুই ॥

দার্জিলিংয়ের অনন্য শৈলশ্রেণি, কখনও উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে বরফঢাকা রুপালি পাহাড়চূড়া, কখনও মেঘে ঢাকা, যেন এক নীরবতা। এরই মাঝে দুটি হৃদয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। একদিকে ঐশ্বর্যশালী স্যার দিনশা পেটিটের কন্যা রতনবাই পেটিট। অন্যজন মহম্মদ আলি জিন্না। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জাতির জনক। ষোলো বছরের লেডি রতির সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের বিপত্নীক জিন্নার প্রেম।

স্যর দিনশা তাঁর ব্যারিস্টার বন্ধু মহম্মদ আলি জিন্নাকে দার্জিলিং বেড়াতে আসার নিমন্ত্রণ করেন। স্যর দিনশার বাড়িতে তাঁর অসাধারণ সুন্দরী ষোড়শী কন্যা, তখনকার বোম্বাইতেও সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত রতির সঙ্গে জিন্নার আলাপ।

রূপমুগ্ধ জিন্না। পাহাড়ি মনোরম পরিবেশে অসমবয়সি দু'জন একে অপরের প্রেমে পড়েন। ভারতীয় রাজনীতির প্রায় শীর্ষে অবস্থিত জিন্নাই শেষ পর্যন্ত সুশিক্ষিতা, সে সময়ের সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ঘরানায় কেতাদুরস্ত, বহির্মুখী, দ্বিতীয় ব্যারোনেটের সুন্দরী কন্যা 'The flower of Bombay' রতিকে প্রেম নিবেদন করেন জিন্না!

আশঙ্কাসহ একদিন ডিনারের সময় জিন্না দুই ধর্মের মধ্যে বিয়ে নিয়ে স্যর দিনশার কী মত জানতে চান। উত্তর আসে, দুই ধর্মের মিলন হলে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে। উত্তরটা জিন্নাকে খুশি করে। স্বভাবতই জিন্না সাহস করে ওই সময়ে স্যর দিনশা পেটিটের কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। এবার নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের এই অকল্পনীয় প্রস্তাবে তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। উত্তেজিতভাবে সেই মুহূর্তে ঘর থেকে অতিথিকে বেরিয়ে যেতে বলেন। কারণ বন্ধুস্থানীয়ের প্রস্তাবে বিস্মিত স্যর দিনশার কাছে শুধু ধর্মের ভেদ নয়, বয়সটাও বিচার্য হয়ে ওঠে। রতি তখন মাত্র ষোলো বছরের, পিতামাতার একমাত্র কন্যা। এই পরিবারের সদস্যা ঊনত্রিশ বছর বয়স্কা তখনও অবিবাহিতা তার একমাত্র পিসি হেমাবাই, ফরাসি বোর্ডিং স্কুলে স্নাতকস্তরের ছাত্রী।

অনেক চেষ্টাতেও জিন্না স্যর দিনশার মত বদলাতে পারলেন না। অপরদিকে জিন্নার সঙ্গে তাঁর কথা বন্ধ হল। মেয়ের ওপর আদেশ হল জিন্নার সঙ্গে দেখা বা মেলামেশা চলবে না। শুধু তাই নয়, স্যর দিনশা কিছু একটা আন্দাজ করে কোর্ট থেকে আদেশ আনালেন যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার সঙ্গে জিন্না দেখা না করতে পারেন। মনে রাখার মতো কথা হল, জিন্না রতির বাবার চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট!

দু'জনের মাঝখানে বাধার প্রাচীর তুললেন স্যর দিনশা। ফল হল বিপরীত। তাদের গোপন মেলামেশা আরও বেড়ে গেল। প্রণয় নিবেদনে চিঠি চালাচালি হতে থাকল। শীলা রেড্ডি তাঁর 'Mr. and Mrs. Jinnah, The Marriage that shook India' বইতে লিখছেন, 'একবার রতিকে একটি চিঠি পড়তে দেখে ফেলেন দিনশা। তিনি চিৎকার করে ওঠেন, এটা জিন্নার চিঠি নিশ্চয়ই। খাবার টেবিলের চারদিকে দৌড়তে থাকেন স্যর দিনশা যাতে জিন্নার চিঠিসহ হাতেনাতে ধরে ফেলা যায় রতিকে। কিন্তু তিনি মেয়েকে ধরতে পারেননি।'

বিশিষ্ট সফল আইনবিদ, তখনই সেরা রাজনীতিবিদ জিন্নাকে রাজনীতিতে আগ্রহী ষোড়শী রতি ধর্মীয় বাধা, বয়সের বাধাকে পেরিয়ে বরণ করতে চাইল। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর আত্মজীবনী 'The Scope of Hapiness: A Personal Memoir' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জিন্না তখনকার উঠতি নেতা ও নামী উকিল। রতির হয়তো তা ভালো লেগেছিল।' কিন্তু সেরা আইনবিদ জিন্না, রতির আঠারো বছর বয়স না হওয়া অবধি চুপচাপ থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এরপর কালের নিয়মে ১৯১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এল। রতির ১৮ বছর বয়স হল। এখন সে প্রাপ্তবয়স্কা। প্রত্যেকবারের মতো পেটিট ধনী পরিবারের সন্তান, তিন ভাইয়ের একমাত্র বোন রতির জমকালো জন্মোৎসবের আয়োজন হল বম্বের তাজমহল হোটেলে। ডিনার স্পিচের পরে সমস্ত সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সামনে রতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ পাপা' এবং তারপর সে যেন একটা বোমা ফাটাল। সে শান্তভাবে সমবেত অতিথিবৃন্দকে জানাল, সে জিন্নার কাছ থেকে বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তারা শীঘ্র বিয়ে করবে। অভ্যাগতদের সে উইশ করতে বলল এবং চারদিকে নীরবতা নেমে এল।

শেষ পর্যন্ত সেই কথাই খাটল। 'মিঁয়া বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি।' তারিখটা ছিল ২০ এপ্রিল ১৯১৮। স্যর দিনশা প্রাতরাশ খেতে টেবিলে বসে খবরের কাগজ 'Bombay Chronicle' পড়ছিলেন। আটের পাতায় এসে একটা খবরে তাঁর চোখ আটকে গেল। খবরটা হল, স্যর দিনশার কন্যা লেডি রতিকে মহম্মদ আলি জিন্না আগের দিন সন্ধ্যায় বিয়ে করেছেন। হতভম্ব স্যর দিনশার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। ইতিপূর্বে তাঁর অগোচরে রতি গৃহত্যাগ করে। জিন্নার এক জীবনী লেখক শারিফ আল মুজাহিদ লিখেছেন, '১৯১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লেডি রতি ১৮-তে পা দিলেন। আর সেদিনই তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন একটা ছাতা আর একজোড়া পোশাক নিয়ে।'

জিন্না রতিকে নিয়ে জামিয়া মসজিদে যান ও রতির সম্মতিক্রমে তাঁকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। পরের দিন ১৮ এপ্রিল ইসলামি মতে তাঁদের দু'জনের নিকাহ সম্পন্ন হয়। সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিয়ে নয় কেন? এ বিষয়ে খাওয়াজা রাজি হায়দার তাঁর 'Ruttie Jinnah: The Story Told And Untold' বইতে লিখছেন, 'তখন জিন্না ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি যদি সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করতেন, তাহলে তাঁকে সম্ভবত কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ

করতে হতো। ইসলামি মতে, সেজন্যই তিনি বিয়ে করেছিলেন আর এতে রতিও রাজি হয়েছিলেন।'

এই বিয়ে তখনকার ভারতীয় সমাজে ভয়ানক আলোড়ন তুলল। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর বইতে লিখছেন, 'পার্শি সম্প্রদায়ের বিরাট ধনী ব্যক্তি স্যর দিনশার মেয়ের সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার বিয়ের ঘটনা আন্দোলিত হয়েছিল গোটা দেশেই।' পারিবারিক স্তরে পেটিট পরিবার আঘাত পেল। শুধু ভিন্ন ধর্মীয় নন, জিন্নার সঙ্গে রতির ছিল বিশাল বয়সের ব্যবধান। এই বিয়ের জন্য পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষজন রতির পাশাপাশি তাঁর মা-বাবার উপরও প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ হন।

পার্সি পঞ্চায়েত তাদের দুটো বিকল্প পথ দেখাল। এক, তারা মেয়েকে নিয়ে সমাজচ্যুত হতে পারে। দুই, মেয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে পার্সি সমাজে থাকতে পারে। পেটিটরা দ্বিতীয় বিকল্প বেছে নিল। রতিকে জিন্না খুব ভালোবেসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সৈয়দ মামুদকে পাঠানো একটা চিঠিতে সরোজিনী নাইডু রতির অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা লিখেছেন।

জিন্নার বিষয়ে লিখেছেন, 'কিন্তু জিন্নার এটা কৃতিত্ব, সে রতিকে খুবই ভালোবাসে। আত্মকেন্দ্রিক আর চাপা স্বভাবের জিন্নার এটা একটা মানবিক চেহারা।' নিকাহনামায় লেখা ১০০১ টাকা দেনমোহরের জায়গায় জিন্না সেকালে রতিকে উপহার দিয়েছিলেন একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। অন্যদিকে জিন্না পরিবারের ব্যক্তিগত বন্ধু কাঞ্জি দ্বারকাদাস তাঁর 'Ruttie Jinnah: The Story of a Great Friendship' বইতে স্মৃতিচারণায় রতির ফ্যাশনদুরস্ত ব্যক্তিত্ব ও অপার সৌন্দর্যে তাঁর নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। যতক্ষণ না তিনি আমার নজর দেওয়াটা ধরে ফেলছেন, ততক্ষণ উপভোগ করতাম সেই সৌন্দর্য।' তাঁর পোশাক, আদবকায়দা, চলাফেরা আর আকর্ষণীয় হাসি আশপাশের মানুষের কাছে ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর সমস্ত আচরণে জিন্নার সমর্থন থাকত। খাওয়াজা রাজি হায়দারের বর্ণনায় পাওয়া যায়, বম্বের গভর্নর উইলিংডন জিন্না দম্পতিকে খেতে ডাকেন। লেডি রতি একটি লো-কাট পোশাক পরে খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে বসলে লেডি উইলিংডন লেডি রতিকে একটি শাল এনে দিতে বলার ইঙ্গিতে অপমানিত জিন্না স্ত্রীকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

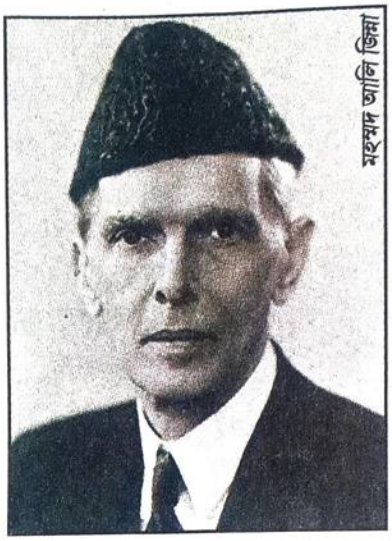
মহম্মদ আলি জিন্না

রতি খুব স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক ছিলেন। হায়দার লিখছেন, আর একটি ভোজসভায় লেডি রতি লর্ড রিডিংয়ের পাশে বসেছিলেন। জার্মান যাওয়ার প্রসঙ্গে লর্ড রিডিং বললেন, যুদ্ধের পরে জার্মানরা ব্রিটেনের লোকদের পছন্দ করে না, তাই সেখানে যাওয়া যাবে না। রতি মুখের ওপর বলে দিলেন, 'তো আপনি ভারতে কী করতে এসেছেন?' ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

শীলা রেড্ডির লেখাতে পাওয়া যায়, লর্ড চেমসফোর্ডের আমন্ত্রণে সিমলার ভাইসরয় লজে জিন্না দম্পতি খাওয়ার আমন্ত্রণে যান। রতি ভারতীয় কায়দায় হাতজোড় করে ভাইসরয়কে অভিবাদন জানান। ভোজন শেষে ভাইসরয় রতিকে পরামর্শ দেন, স্বামীর উন্নতিতে 'আপনার সেরকমই করা উচিত যেমনটা রোমে থাকলে রোমের বাসিন্দারা করে থাকেন।' রতি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিলেন, 'ভারতে আছি, তাই ভারতীয় কায়দায় আপনাকে অভিবাদন জানালাম।'

শুরুর দিকে এই দম্পতির দাম্পত্যে খুবই খুশিভাব, উচ্ছলতা ও আনন্দ বিরাজ করত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনীতিতে ভয়ানক ব্যস্ততা ও খানিকটা বয়সের ব্যবধানের কারণে ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। স্ত্রী ও কন্যাকে জিন্না সময় দিতে পারছিলেন না। সেসময় রতি ছেলেমানুষ ও অবুঝের মতো জিন্নার মনোযোগ চাইতেন। জিন্নার এক সময়ের সচিব, পরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এম সি চাগলা তাঁর আত্মজীবনী 'Roses In December'-এ লিখছেন, 'তখন রতি একটু বেশিই সাজগোজ করে চলে আসতেন আর জিন্নার টেবিলের ওপরে বসে পা দোলাতেন। মনে হতো জিন্না কখন কথাবার্তা শেষ করে বাইরে বের হবেন তাঁকে নিয়ে। নির্বাক, ভাবলেশহীন জিন্না বিনা বিরক্তিতে তাঁর কাজ করে যেতেন।'

একটা সময় এল যখন রতি-জিন্না বিচ্ছেদ হল। ১৯২৮ সালের শুরুতে বম্বের তাজমহল প্যালেস হোটেলের একটা স্যুটে থাকতে এলেন রতি। আট বছরের মেয়ে দিনা জিন্না দাদির কাছে থাকতে গেল। সেবার বসন্তকালে মায়ের সঙ্গে প্যারিস ভ্রমণের সময় রতি অসুস্থ হয়ে কোমায় চলে যান। ডিপ্রেশন এবং পরে অন্ত্রে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরার সময় স্বামীকে রতি একটি চিঠি লেখেন, যা স্বামীকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি। — 'তুমি আমাকে সেই ফুলটার মতো মনে রাখার চেষ্টা কর যা তুমি ছিঁড়ে এনেছিলে, যা তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছ। আমার প্রিয়, আমি তোমাকে ততটা ভালোবেসেছিলাম যা মাত্র অল্প কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে। ...আমার প্রিয়, আমার প্রিয়, আমি তোমাকে কেবল এই মিনতি করি যে ভালোবাসার যে বিয়োগান্তক পরিণতি এসেছিল তা এর সঙ্গেই শেষ হওয়া উচিত।'

এর দু'মাস পর ১৯২৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বম্বাইয়ের তাজমহল প্যালেস হোটেলে বাসকালীন রতি অচেতন হয়ে পড়েন। পরের দিন ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনে মাত্র ২৯ বছর বয়সে রতি জিন্না মারা যান।

ওয়েস্টার্ন কোর্ট ভবনে জিন্নার কাছে তাঁর শ্বশুর স্যর দিনশা পেটিটের একটা ট্রাঙ্ক কল এল, তাঁর মেয়ের গুরুতর অসুস্থতার খবর নিয়ে। দশ বছর পর এই প্রথম। পথে অনেক শোকজ্ঞাপক টেলিগ্রাম আসে। জিন্না বুঝে যান।

তিনি বম্বের খাজা শিয়া ইশনা আসারি জামাত আরামবাগ সিমেটারি'-তে পৌঁছে যান। একেবারে নিকটজন হিসেবে কবরে মাটি দেওয়ার সময় তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। জীবনে এই প্রথম। আরও একবার তিনি এরকম কেঁদেছিলেন। সেও রতির জন্য। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান যাওয়ার আগে শেষবারের মতো রতির সমাধিস্থল দর্শনের সময় চাপা স্বভাবের জিন্না জনসমক্ষে প্রকাশ্যে কেঁদেছিলেন।

যক্ষ্মারোগে ভুগে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর করাচিতে ৭১ বছর বয়সে জিন্নার জীবনাবসান হয়। রতি মারা যাওয়ার সময় জিন্নার বয়স ছিল ৫৩ বছর। এরপর জিন্না আর বিয়ে করেননি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ, উনিশ শতকের দুই কবি ও কল্লোলিনী তিলোত্তমার কাহিনি। ডিহি কলকাতা থেকে আলোকিত মহানগর হওয়ার গল্প। দুই কবির দুশো বছরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ এই ঐতিহাসিক আখ্যান।

# টিমোথি ও সাথতার গোঁসাই

পর্ব ৮১

**দেবতোষ দাশ**

**আগে যা ঘটেছে...**

শরৎবাবু বিদ্যাসাগর আর মধুসূদনের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন, মতামত ব্যক্ত করতে বলেছেন, থিয়েটারে মেয়েদের প্রবেশাধিকার বিষয়ে। বিদ্যাসাগর মত না দিলেও একবাক্যে সায় দেন মধুসূদন।

'দত্ত, তোমার পাওনা টাকা আমি পরিশোধ করতে পারব না! তুমি এক কাজ করতে পার, ইউরোপ থেকে মহাকবিদের মূর্তি এনেছিলাম বহু ব্যয় করে— বেশিরভাগই লাউডন স্ট্রিট বাসা ছাড়ার সময় বেচে দিতে হয়েছে— একটি মূর্তি কেবল বেচিনি —এই বাসায় নিয়ে এসেছিলাম—মিলটন—তুমি নেবে? দাম পাবে।'

চেয়ারে বসে আছেন গোবর্ধন দত্ত। নিশ্চুপ। হুগলি দেবানন্দপুর নিবাসী এই মানুষটির ওয়েলেসলি স্ট্রিটে টেবিল-চেয়ারসহ যাবতীয় আসবাবের একটি দোকান আছে। স্পেন্সেস হোটেল থেকে লাউডন স্ট্রিটে এসে হোটেলের মতোই সুসজ্জিত করতে চেয়েছিলেন সে বাসা। মনের সাধ মিটিয়ে দামি-দামি আসবাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন। সব আসবাবই এসেছিল গোবর্ধন দত্তের দোকান থেকে। বলা বাহুল্য, পুরোটাই বাকিতে। শহরের পরিচিত মুখ মধুসূদন দত্ত। তাছাড়া গোবর্ধন নিজেও রাজা দিগম্বর মিত্রের ভগ্নীপতি। অতগুলো টাকা তাই বাকি দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু ধার শুধতে অপারগ কলকাতার কবি। গোবর্ধন কবির বর্তমান অবস্থা জানেন, টাকা ফেরত পাওয়ার আশা তিনি করেন না। তবু একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছেন কবির বাসায়। কবির কুণ্ঠা আর দেনা শুধবার বিভিন্ন পদ্ধতি শুনে তিনি এখন যারপরনাই লজ্জিত। আজ তো আর প্রথম আসেননি, টাকার তাগাদায় কবির কাছে এর আগেও বারকতক এসেছেন। মধুসূদনের কথা শুনে এবং তাঁর ঔদার্য দেখে পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। মানে মুখ ফুটে টাকা চাইতেই পারেননি। জল-মিষ্টি খেয়ে বিদায় নিয়েছেন।

'আরও কিছু দামি জিনিস আমি তোমায় দিতে পারি দত্ত, নেবে?

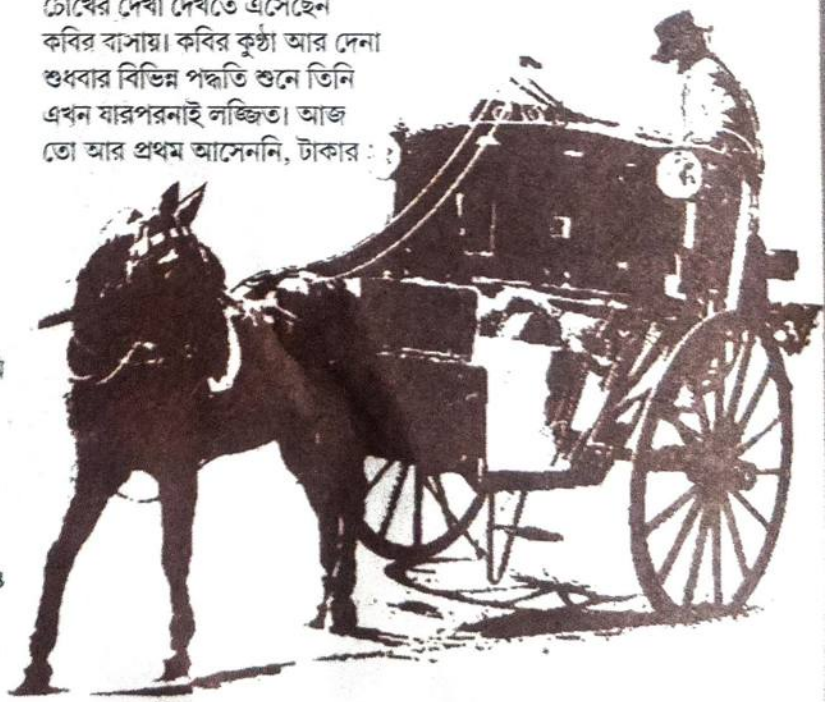

বেশ কিছু দামি বই এখনও আমার আছে —ডাঁই করে ফেলে রেখেছি— দু'দিন পরে ওগুলো আর কী কাজে লাগবে! তুমি বরং নিয়ে যাও! বেচে কিছু টাকা তুমি পাবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি!'

মাথা নিচু করে দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে অস্ফুটে গোবর্ধন বলেন, 'আমায় মাফ করবেন দত্তবাবু, আমি পাওনাদার হয়ে আজ আসিনি— আপনাকে দেখতে এসেছিলুম! এইসব কোনও জিনিসপত্রই আমি গ্রহণ করতে পারব না—আমায় মাফ করবেন!'

কবির কানে কথা যাচ্ছে না, তিনি বিচলিত ভঙ্গিতে বলেই চলেছেন,

'গোবর্ধন, আরও একটা কাজ তুমি করতে পার, আমার কিছু অপ্রকাশিত কবিতা আছে, ছাপাতে পারলে কিছু টাকা অবশ্যই পাবে! মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার দাম কি বাঙালি দেবে না, আলবাত দেবে! তুমি নেবে?'

বিব্রত গোবর্ধনের ধরণী দ্বিধা হও দশা! কবির কুণ্ঠা, আর্তি ও বিপন্নতা দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হয় তাঁর। আরও দু'চার মিনিট অতিবাহিত করে চলে যান তিনি। যেন পালিয়ে বাঁচেন। বন্ধুবান্ধবরা অবাক হয়, 'হ্যাঁ রে গোবর্ধন, দেড়-দু'হাজার টাকা মাগনা ছেড়ে দিবি! যা দিচ্ছিল নিয়ে আসতে পারতিস!'

সজোরে মাথা নেড়ে গোবর্ধন বলেন, 'বেশিরভাগই নেই, বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন, অবশিষ্ট যেগুলো পড়ে আছে —যে-সে লোক তো নন, মহাকবি! সেই মহাকবি এখন মৃত্যুপথযাত্রী ও দেউলিয়া, তাঁর ঘর শূন্য করে সেইসব সজ্জা উপকরণ নিয়ে চলে আসতে পারব না! কী বলছ তোমরা, আমি কি মহাপাতকের পথে গমন করব!'

শীতকাল চলে গিয়েছে অনেকদিন হল। হালকা শীত-শীত ভাবও উধাও। মাইকেল শীতে ভালো থাকে। চৈত্র মাস পড়তেই গরম বেড়ে গিয়েছে বিস্তর। মাইকেলের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে ভাবতে হেনরিয়েটা বুঝতে পারছেন তাঁর নিজের শরীরও ভাঙছে ক্রমশ। মদ্যপানের নেশা তিনি ছাড়তে পারেননি। মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে মদ তাঁকেও গ্রাস করেছে বহুদিন। এখন শরীর জানান দিচ্ছে সেই বিষপানের ফলাফল। মাঝেমাঝে সন্তানদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করেন। মা-বাবাকে হারিয়ে তারা কীভাবে জীবন কাটাবে! এখনও যে তারা শৈশব পেরয়নি! কেবল শর্মিষ্ঠা সাড়ে তেরো হল। ওর কথা ভেবে রাতে ঘুম আসে না হেনরিয়েটার। এখনই মেয়েটিকে পাত্রস্থ না করতে পারলে ওর জীবনে সর্বনাশ নেমে আসবে! মা-বাবা হয়ে কীভাবে সহ্য করবে তাঁরা! মরেও যে শান্তি পাবেন না! মাইকেলও মরিয়া মেয়েকে বিয়ে দিতে। কোর্টশিপ ছাড়া সটান বিয়ে তিনি করতে পারবেন না বলে আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে পিতৃআজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেননি, কেবল তাই নয় নিজ ধর্মও পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন! সেই মাইকেল আজ নিজ মনোমতো জীবনসঙ্গিনী নয়, বাপ-মায়ের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে সম্মত হচ্ছেন! কিছুই করার নেই কারণ মরণের ডাক তিনি শুনে ফেলেছেন! এহেন অবস্থায় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! নতুন বছরের বৈশাখেই সাড়ে তেরোর শর্মিষ্ঠাকে সঁপে দিলেন কন্যার ঠিক দ্বিগুণ বয়সি অল্পশিক্ষিত এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবক উইলিয়ামের হাতে। ছবি আঁকে সেই ছেলে কিন্তু ছবি এঁকে সংসার চালানো অসম্ভব। জামাই তাই হাইকোর্টে অনুবাদের কাজ করে। দেউলিয়া হলেও কন্যার বিবাহে সামান্য অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল, করলেন চিরকালের বন্ধু গৌরদাস। গৌর হাওড়ায় বদলি নিয়ে এসেছে। আমন্ত্রণের চিঠিও ছাপা হল। মিস্টার অ্যান্ড ম্যাডাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রেজেন্ট দেয়ার কমপ্লিমেন্টস টু বাবু গৌরদাস বসাক অ্যান্ড রিকোয়েস্ট দ্য প্লেজার অব হিজ কম্প্যানি টু উইটনেস দ্য ন্যুপশিয়ালস অব দেয়ার ওনলি ডটার হেনরিয়েটা এলিজা শর্মিষ্ঠা টু উইলিয়াম ওয়াল্টার ইভান্স ফ্লয়েড অ্যাট সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল অন ওয়েডনেসডে

গোবর্ধন, আরেকটা কাজ তুমি করতে পার, আমার কিছু অপ্রকাশিত কবিতা আছে, ছাপাতে পারলে কিছু টাকা অবশ্যই পাবে! মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার দাম কি বাঙালি দেবে না, আলবাত দেবে! তুমি নেবে?'

অ্যাট ফাইভ পিএম অ্যান্ড দেন্স টু দেয়ার রেসিডেন্স, ২২ বেনিয়াপুকুর রোড। কলকাতা। শেষে লেখা, কেক অ্যান্ড ওয়াইন। শুধুমুখে অতিথিদের ছাড়েননি মাইকেল, খাদ্য ও পানীয়ের বন্দোবস্ত করেছেন।

একমাত্র কন্যাকে বিদায় দিয়ে বেনেপুকুরের বাসায় আর থাকতে পারলেন না মধুসূদন। অসহ্য লাগে শর্মিষ্ঠার শূন্যতা। দুই ছেলে খেলতে খেলতে থমকে যায়, দিদির জন্য মনখারাপ হয় তাদের। নীরবে কাঁদেন হেনরিয়েটা। মাইকেল উত্তরপাড়ায় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর পাঠান, ভাই রাসবিহারী, তোমার লাইব্রেরির ওপরতলায় কিছুদিন থাকতে চাই। আশা করি ব্যবস্থা করবে।

বিলক্ষণ ব্যবস্থা করলেন রাসবিহারী। বছর দুই-তিন আগে যখন এখানে এসেছিলেন, সে যাত্রা ছিল বিলেতের মতো ছুটি কাটানোর বিলাসিতা! আজ বিলাসিতার তো প্রশ্নই ওঠে না, কবি যেন পালিয়ে এসেছেন পরিবার নিয়ে পাছে চিকিৎসা করাতে হয়! চিকিৎসা করার মতো কানাকড়িও নেই তাঁর পাতলুনের পকেটে। ইজিচেয়ারে বসে মাইকেল সন্ধ্যায় তাকিয়ে থাকেন তারাময় বিশাল আকাশের দিকে। এই আকাশের নীচে বিপুল বিশ্বে কোথায় যশোরের সাগরদাঁড়ি, কোথায় কলকাতা, উত্তরপাড়া আর কোথায়ই বা লন্ডন বা ভার্সাই— বুঝতে চেষ্টা করেন। থই পান না। কিছুই থেমে থাকে না এই বিশ্বে। সবই চলমান, সক্রিয়। কেশে কেশে মুখ দিয়ে রক্ত তুলছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কার তাতে কী! তামাম দুনিয়ার কিছুই এসে যায় না সেই রক্তক্ষরণে! খুকখুক করে কাশেন। জোরে কাশার শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই! হেনরিয়েটা পড়ে থাকেন ঘরে। পারতপক্ষে আসেন না মাইকেলের সামনে, পাছে ধরা পড়ে যায় তাঁর শরীরের অবস্থা! মাইকেল বোঝেন না এমন নয়! তিনি জানেন দোরগোড়ায় তাঁদের যুগলের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু! সফেদ! মৃত্যুর রং কি সাদা!

আজকাল বড় গান শুনতে ইচ্ছা করে। যশোরে থাকাকালীন ছেলেবেলায় ফারসি শিখেছিলেন। হিন্দু কলেজে এসে বন্ধুদের তখন গজল শোনাতেন। মন্দ ছিল না তাঁর গানের গলা। সুরও ছিল কণ্ঠে। ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর ভাঙতে ভাঙতে আজ ক্ষীণ স্বরে আওয়াজ বেরয়। মাঝেমাঝে ঠাহর করতে

পারেন না এ তাঁর নিজেরই স্বর কি না! ঠুমরি শুনতে বড় মন চায় ইদানীং। কিন্তু কীভাবে শুনবেন? কলকাতায় নিশ্চয়ই আসর বসে, কিন্তু কেউ ডাকে না তাঁকে!

ইতনি আরজ মোরি মান লে সাঁইয়া
মিনতি করহুঁ পড়হুঁ পাইয়াঁ
হা হা করত হুঁ কর জোড়ত হুঁ
অব না বিসারো আখতার গোসাঁইয়া।

লক্ষ্মীজানের গলায় শুনেছিল এই ঠুমরি। নবাব ওয়াজিদ আলির কলম। নবাব এই পদেই মাত্র একবার কেবল ব্যবহার করেছিলেন আখতার গোসাঁই নাম। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই নবাবের সঙ্গে, তিনি কি এখনও গান-বাজনা নিয়েই আছেন? মজে আছেন ফেলে আসা পুরনো লখনউ আর ঘুরঘুর করছেন স্মৃতির অলিন্দে? আর কী-ই বা করবেন? তিনি তো অতীতের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছেন। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার মতো তাঁকে কেউ বলার নেই, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' যদি এমন কেউ থাকতেনও, প্রশ্নের উত্তরে নবাব নিশ্চিতভাবেই বলতেন, 'এই হারিয়ে যাওয়াতেই আমার আনন্দ!'

মধুসূদনের ধারণায় ভুল নেই। বস্তুত নবাব নতুন এক গায়কে মজে আছেন ইদানীং। রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আসরে এঁকে আবিষ্কার করেছেন স্বয়ং লক্ষ্মীজান। প্রতি শনি-রবি সমঝদার রূপচাঁদের বাড়িতে বসে আসর। রূপচাঁদের আমন্ত্রণে উস্তাদরা মাতান আসর। লক্ষ্মীও যান মাঝেমধ্যে। রাস বা দোলের আসরে তো অবশ্যই যান। সুলতানও আসেন। সেখানে একদিন সপ্তাহান্তের এক আসরে, এক গায়ককে ধ্রুপদ গাইতে দেখেন লক্ষ্মী। মুগ্ধ হয় শুনে। যদুনাথ ভট্টাচার্য গায়কের নাম। লোকমুখে যদুভট্ট। ভালো শিল্পীর কদর না করলে চলে বুঝি! নবাবের কানে লক্ষ্মী তুলে দেয় যদুভট্টের নাম। লক্ষ্মীর মুখে ভরপুর প্রশংসা শুনে তাঁকে নিজের মেটিয়াবুরুজের কসরুল বায়জার নামক ডিম্বাকৃতি দরবারে আমন্ত্রণ জানান নবাব।

অতীব সাধারণ বেশভূষা ও চেহারার মানুষটিকে দেখে মহারাজ যতটা অবাক হলেন, গান শুনে হাঁ হলেন আরও বেশি। দরবারি কানাড়ায় ধ্রুপদ গাইলেন যদুনাথ। 'রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি / মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী'। এমন কৃশকায় মানুষের কণ্ঠ থেকে এই আওয়াজ বেরচ্ছে কী করে! খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন নবাব। আসলে নির্বাক হলেন তো প্রকাশ্যে, মনে মনে কী ভাঁজছেন অন্য সভাসদদের মালুম হল। এমনতর ফনকারকে নিজের দরবারে পাকাপাকি না এনে নবাবের শান্তি হয় নাকি! যথারীতি মহারাজ প্রস্তাব দিলেন যদুভট্টকে। কিন্তু যদুনাথ হাতজোড় করে বললেন,

'সুলতান, মাফ করবেন, জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর আমার গান শুনেছেন, তিনি চান আমি যেন তাঁদের আদি ব্রাহ্মসমাজে গাই— সমাজের গায়ক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি আমায় পেতে চান। কথা দিয়েছি তাঁকে। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ছেলেপুলেদের গান শেখাবার কথাও চলছে। মহর্ষিকে উপেক্ষা করে কীভাবে মানে...'

ইতস্তত করেন যদুনাথ। তাঁর দ্বিধার কথা বুঝতে পারেন নবাব। হেসে বলেন, 'ঠাকুরসাব যখন আপনাকে নিজের কাছে রাখতে চাইছেন, তাহলে আপনি তো অবশ্যই থাকবেন। মহর্ষির সঙ্গে থাকা মানে সঙ্গীতের সঙ্গেই থাকা, সেখানে আমি নাক গলাবার কে! কেবল একটা কথা, মাঝেমাঝে এসে এই দরবারে নিজের পায়ের ধুলো দেবেন —গানবাজনা ছাড়া লখনউয়ের প্রাক্তন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের আর কিছুই নেই! আসবেন তো যদুনাথজি?'

'জরুর!'

সুলতানকে আশ্বস্ত করে মুহূর্তে ফের গান ধরলেন যদুনাথ। রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া। কাফি সুরে বর্ষার গান। ভরা গরমে বৃষ্টির সুর শুরু হতেই কিছুক্ষণ পরে সুলতানের মনে হল ঘরে বুঝি বর্ষণ শুরু হয়েছে!

ওদিকে একই আকাশের নীচে মধুসূদন তীব্র গরমে বিনা চিকিৎসায় বসে আছেন উত্তরপাড়ায়, সন্ধ্যায় গঙ্গার হাওয়া এসে জুড়িয়ে দেয় ক্লান্তি, কবি দিন গোনেন সাদা আলোর এক পৃথিবীর। সেই আলোয় কিছুই দেখা যায় না, ঝলসে যায় চোখ। কবি ইদানীং ঘনঘন দেখতে পান সেই আলো।

'গৌরদা ওঁকে দেখতে সাধারণ পাঠাগারে ঢুকেই দেখেন বিছানায় বসে হাঁফাচ্ছেন মধুদা—ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত—বউঠান পড়ে আছেন মেঝেয়—কাতরাচ্ছেন—জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর—ভুল বকছেন মাঝেমধ্যে—'

হাইকোর্টে প্রায়ই মনোমোহনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আজ এসে মধুসূদনের খবর পান সকাল-সকাল। শুনেই উতলা হন। যেতে চান উত্তরপাড়া। তাঁকে নিরস্ত করেন মনোমোহন।

'উত্তরপাড়ায় গিয়ে লাভ নেই নতুন, আগামী কাল ওঁর কলকাতা ফেরার কথা।'

'কে বললে?'

'মধুদার বন্ধু গৌরদাস বসাক। গৌরদা এখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকদিন হল বদলি হয়ে এসেছেন। উনি গিয়েছিলেন উত্তরপাড়া — সে এক ভয়াবহ দৃশ্য—'

চুপ করে গেলেন মনোমোহন। গলা যেন ধরে এল। হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

'গৌরদা ওঁকে দেখতে সাধারণ পাঠাগারে ঢুকেই দেখেন বিছানায় বসে হাঁফাচ্ছেন মধুদা—ঠোঁটের কোণ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। বউঠান পড়ে আছেন মেঝেয়—কাতরাচ্ছেন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। ভুল বকছেন মাঝেমধ্যে...'

'চিকিৎসা না করে ওখানে গিয়ে কেন বসে আছেন!'

'গৌরদা বললেন, আমি ঘরে ঢুকতেই মধু সামান্য নড়েচড়ে উঠল, চেষ্টা করল উঠে বসতে—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল— বউয়ের দিকে হাত দেখিয়ে বললে, ওকে দেখ! আমি নুয়ে পড়ে হেনরিয়েটার নাড়ি আর কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করলাম —হেনরিয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, হাত উঁচিয়ে বললে, ওঁর পরিচর্যা করুন, ওঁকে বাঁচান—মৃত্যুকে আমি কেয়ার করি না!'

কানে হাত দিয়ে বসে পড়লেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই দুর্দশার কথা আর শুনতে পারছেন না তিনি। অসহ্য! তাঁর কাঁধে হাত দিলেন মনোমোহন।

'আগামী কাল বউঠান চলে যাবেন শর্মিষ্ঠা আর জামাইয়ের কাছে— লিন্ডসে স্ট্রিটে ওদের বাসায়—'

'আর মধুসূদনবাবু?'

'মধুদাকে ভর্তি করা হবে প্রেসিডেন্সি জেনারেলে!' *(চলবে)*

# বাংলার ‘ছেলে ভুলানো’ ছড়া

## চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

লোকসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ‘ছেলে ভুলানো’ ছড়ার প্রথম নির্যাসটি আমাদের চেতনায় দান করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লোকসাহিত্য সংকলনটি বাংলার এই শিল্পকর্মের মূল আধার। তিনি লিখেছেন, ‘এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি বীরত্ব আছে। কোনওটির কোনওকালে কোনও রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।’ (লোকসাহিত্য-প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উৎসাহে যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর কালজয়ী ‘খুকুমণির ছড়া’ সংকলনটি প্রকাশ করেন। ‘আধুনিক ভারতীয় আর কোনও ভাষায় সাহিত্যে এ বইটির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বইটির মর্যাদা কখনই কমবে না।’ (ভূমিকা: সুকুমার সেন, বাংলাদেশের ছড়া: ভবতারণ দত্ত)।

এরও পরে আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ভবতারণ দত্তের বই দু’টি ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সব ছড়াই মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে। ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার সময় ব্যবহৃত ছড়া ও ধাঁধা শ্রেণির ছড়া। কোনও সংকলকই কলকাতা বিষয়ক ছড়ানো ছড়াগুলিকে একত্রে বাঁধার চেষ্টা করেননি। একমাত্র হরিহর শেঠ লিখিত ‘প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়’ বইটিতে একটি আলাদা পরিচ্ছদই শুধু আছে, কলকাতা বিষয়ক কিছু সংখ্যক ছড়া নিয়ে।

আসলে ছড়াগুলি যেহেতু প্রচলিত। বহু মুখ, বহু যুগ ঘুরে এসে লিপিবদ্ধ হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তাতে বেশ কিছু পরিমার্জিত শব্দ লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে সে ছড়াগুলিতে স্থানীয় ভাষার প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। যদিও ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি’র সম্পাদনায় ‘বেঙ্গল গেজেট’ ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। তবে এই ছড়াগুলির প্রথম লিপিবদ্ধ রূপ দেখতে পাই সেকালের বটতলায় ছাপা কিছু পত্রিকায়। যেমন ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১), সম্বাদ রসরাজে (১৮৩৪), পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪০), দল বৃত্তান্ত (১৮৩২) ইত্যাদি। ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮২৪ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৩৮-এ বঙ্কিমচন্দ্র এবং ১৮৪০ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ। ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার সাময়িকপত্র বাংলা সাহিত্যে খোলা হাওয়ার বাতায়ন খুলিয়া দিল। সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করিয়া বাঙালা গদ্যভাষা আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিল। বাঙলা পদ্যও নূতন পথের ইশারা পাইল। যাঁহার রচনায় এই ইশারা জাগিয়াছিল তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই ইশারা কালের ইঙ্গিত।’ (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-২য়: সুকুমার সেন)। ঈশ্বরচন্দ্রর লেখাতেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তৎকালীন কলকাতার চলচ্ছবি।

কলকাতা বিষয়ক প্রথম যে ছড়াটি হৃদয়ে অনুরণন তোলে আজও, সেটা ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অনুযায়ী, ১৭৪০ সালের কাছাকাছি সময়কার। মূল আলোচ্য সেই ছড়াটিই। ভাবতে অবাক লাগে যে অন্য কলকাতা বিষয়ক ছড়াগুলি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বসলেও আজও এটি মায়ের কোলে শুয়ে সন্তানের প্রথম ছেলে ভুলানো ছড়া হিসেবে প্রচলিত:

‘খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ুল/ বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে/ খাজনা দেব কীসে!
ধান ফুরুল পান ফুরুল/ খাজনার উপায় কী?
আর ক’টা দিন সবুর কর/ রসুন বুনেছি।’

১৭৪০ সাল থেকেই আওয়াজটা উঠেছিল। মারাঠা দস্যুরা আসছে লুট করতে। কলকাতা থেকে পালানো শুরু হল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়! সভা বসল লালদিঘির কোণে সদ্য গড়ে ওঠা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্গে। সে সময় যত ইংরেজ সৈন্য শহরে ছিল, তা দিয়ে কেল্লা রক্ষা করা যাবে কি না প্রশ্ন উঠল। রিপোর্ট গেল জাহাজে করে ছ’ মাসের পথ ইংল্যান্ডে। উত্তর এল আবার জাহাজে চড়ে। বছর ঘুরে গেল। কোম্পানির লোকেরা বাগবাজার আর পেরিনম পয়েন্টে দুটো জাহাজ ভিড়িয়ে দিল। বাগবাজারের জাহাজটির নাম ‘টাইগ্রেস’। সেখান থেকে নামল

কামান। সুতানুটি-কলকাতার সাত জায়গায় কামান বসানো হল। কিন্তু মাত্র সাতটা কামান দিয়ে তো আর বর্গি আক্রমণ ঠেকানো যাবে না! এদিকে ক্রমশ বর্গিরা এগিয়ে আসছে। স্থানীয় নেটিভরা হাতে তুলে নিলেন নিজেদের জানমান বসত বাঁচানোর দায়িত্ব। ১৭৪৩ সালের ২৩ মার্চ কোম্পানির কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ধার নেওয়া হল। জনসাধারণ এই টাকা পরিশোধ করবে এই মর্মে দায়ী রইলেন শেঠদের বাড়ি বৈষ্ণব দাস, রামকৃষ্ণ, রাসবিহারী আর উমিচাঁদ। সেই পঁচিশ হাজার টাকা সম্বল করে বাগবাজার থেকে শুরু হল খাল কাটা। ৪২ গজ চওড়া, লম্বায় ৭ মাইল। ছ'মাসে খাল কাটা হল মাত্র তিন মাইল। এই খাল টপকে আসার সাধ্যি বর্গিদের হবে না। খবর এল মারাঠা দস্যু (যারা বর্গি নামে খ্যাত) আর দিল্লির নবাব— এই দুই পক্ষের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। আর বর্গি আক্রমণ হবে না। কিন্তু বাগবাজার থেকে সেদিনের জানবাজার (অধুনা বেকবাগান) পর্যন্ত খাল কাটা হয়ে গিয়েছে ততদিনে। সেই কাটা খাল তারপর পড়ে রইল আরও ষাট বছর। তারপর তাতে মাটি ভরাট করে গড়ে উঠল আজকের সার্কুলার রোড। আর সেই 'মারাঠা ডিচ' কাটতে গিয়ে বাইরের দুনিয়া কলকাতার মানুষদের জানল 'ডিচার' বলে।

বর্গি আক্রমণের সময়েই যে এই ছড়াটি বাঁধা হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছড়ার শব্দচয়ন আজও এত আধুনিক যে এতে অবশ্যই পরবর্তীকালে বহু শব্দ সংযোজিত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। এ ছড়াটা কি কলকাতার কোনও ছড়াকারের দান? কারণ ছড়ার একটি লাইন— 'ধান ফুরুল, পান ফুরুল'— ১৭৪০ সালের কলকাতায় পান বা তাম্বুল চাষের কোনও নির্দিষ্ট নথি পাওয়া যায় না। তাহলে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মূল ছড়াটিতে অনেক নতুন শব্দ পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়ে তা পরিবেশিত হয়েছে! এই ছড়াটিরই আর একটি রূপ দেখা যায় —

'খোকন ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে।
কীসের মাসি, কিসের পিসি, কীসের বৃন্দাবন
সারা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।
শত স্বর্গের সিঁড়ি করতে রাবণ রাজা মরে
খোকনের মুখে স্বর্গ নামে যখন ঘুমের ঘোরে।'
(বাংলাদেশের ছড়া: ভবতারণ দত্ত)

বর্গি আক্রমণ নিয়ে সে সময় কবি গঙ্গারাম রচিত পুঁথি 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বা ভাস্কর পরাভব-এ (১৭৫১) পাওয়া যায়—

'তবে সব বরগি গ্রাম লুঠিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পালাইল...
বাঙ্গালা চোআরি যত বিষ্ণু মোণ্ডর।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।।
এই মতে জত গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়া।।'

অথবা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়—

'লুঠি বাঙ্গালার লোক করিল কাঙাল।
গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।।'

কিন্তু সব ছাপিয়ে শুধু 'খোকা ঘুমাল' ছড়াটিই ছড়িয়ে গিয়েছিল সেকালের সমগ্র বাংলাদেশে। জেলা অনুযায়ী সেখানে প্রচুর শব্দের রকমফের হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলায় 'খোকা ঘুমল, পাড়া জুড়ুল' ছড়াটি যে রূপে পাওয়া যায়—

'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে।।'

চব্বিশ পরগণায় তার প্রচলিত রূপ—

'আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গি এল দেশে
চড়াই পাখি ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে।।'

সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রূপ—

'খুকা ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল বর্গি আইল দ্যাশে।'

দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত বঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী (নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) অঞ্চলের রূপ—

'খোকা গুমহাইলো ঘারাৎস্ উরাইলো গরখী আইলো ধ্যানো...'

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরও ছিল—

'মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে
গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কীসে।।'

পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—

'মণি ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গি আলো দ্যাশে
টিয়ার ধান খাইলে খাজনা দেব কীসে!'

কিন্তু রাজশাহীতে প্রচলিত ছিল সেই আদিরূপই—

'ছেলে ঘুমল পাড়া জুড়ল বর্গি এল দেশে
...আর ক'টা দিন সবুর কর, রসুন বুনে দি।'

'এভাবে একেক জায়গায় একেকভাবে ছড়াটিকে পাওয়া যায়। ছড়াটির কোনওটিতে বুলবুলি, কোনওটিতে টিয়া, কোনওটিতে চড়াই পাখিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। একটিতে 'গুলগুলি' নামক অর্থহীন আজগুবি শব্দও দেখা যায়। অভিজ্ঞদের অভিমত, 'বুলবুলি'র ধ্বনি সাদৃশ্যে হুলহুলি এসেছে। ...যাকে ঘুম পাড়ানোর প্রয়োজন এই ছড়া, তাকে কোনওটিতে পাই 'খোকা', কোনওটিতে 'ছেলে', আবার কোনওটিতে 'মণি' রূপে। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত রূপে 'বর্গির' বদলে 'গরকী'কে দেখা যায়। 'গরকী' মানে সাইক্লোন বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। পাঠকের মনে হতেই পারে যে, 'বর্গি'র বদলে 'গরকী' কেন এসেছে। বাংলায় বর্গির হামলা হয় নবাব আলিবর্দির (শাসনকাল: ১৭৪০-১৭৫৬) আমলে। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু চট্টগ্রামে কখনও বর্গির হামলা হয়নি। ফলে এখানকার অধিবাসীদের বর্গি অত্যাচারে পড়ার অভিজ্ঞতা নেই। আছে 'গরকী'র কবলে পড়ার অভিজ্ঞতা। কারণ সুপ্রাচীন কাল থেকে বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা এখানকার বাসিন্দাদের কাছে সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।... কেউ কেউ বলেন, ছড়াটি 'বর্গি' বাহিত। এর সপক্ষে তাদের যুক্তি হচ্ছে— চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকজনের বর্গি হাঙ্গামার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও পরিচয় ছিল না।... পশ্চিমবাংলা থেকে লোকমুখবাহিত হয়ে হয়ে ছড়াটি চট্টগ্রামে চরণ রাখে। পক্ষান্তরে অন্য এক পক্ষ মনে করেন, ছড়াটি কোনওভাবেই পশ্চিমবাংলা থেকে পথ পরিক্রমায় চট্টগ্রামে প্রবেশ করেনি। বরং বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ ছড়াটি চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমবাংলায় গিয়ে পৌঁছেছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, বঙ্গে বর্গির আক্রমণ হয়েছিল আলিবর্দির আমলে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে। এটাকে এগনো বা পিছনোর কোনও পথ নেই। কিন্তু চট্টগ্রামের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা গরকীর ইতিহাস বর্গি বর্বরতারও বহু বহু আগে থেকে এবং সুপ্রাচীন। তাই আদিপাঠ হিসেবে 'গরকী' যুক্ত ছড়াটাই গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার দাবি রাখে বলে তাদের অভিমত।'... (ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো (প্রবন্ধ)— মহম্মদ নিজামুদ্দিন— ছড়া পত্রিকা— চট্টগ্রাম— ২.২০১২ সংখ্যা)।

ধারাবাহিক

# বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামে

পর্ব-৪২

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

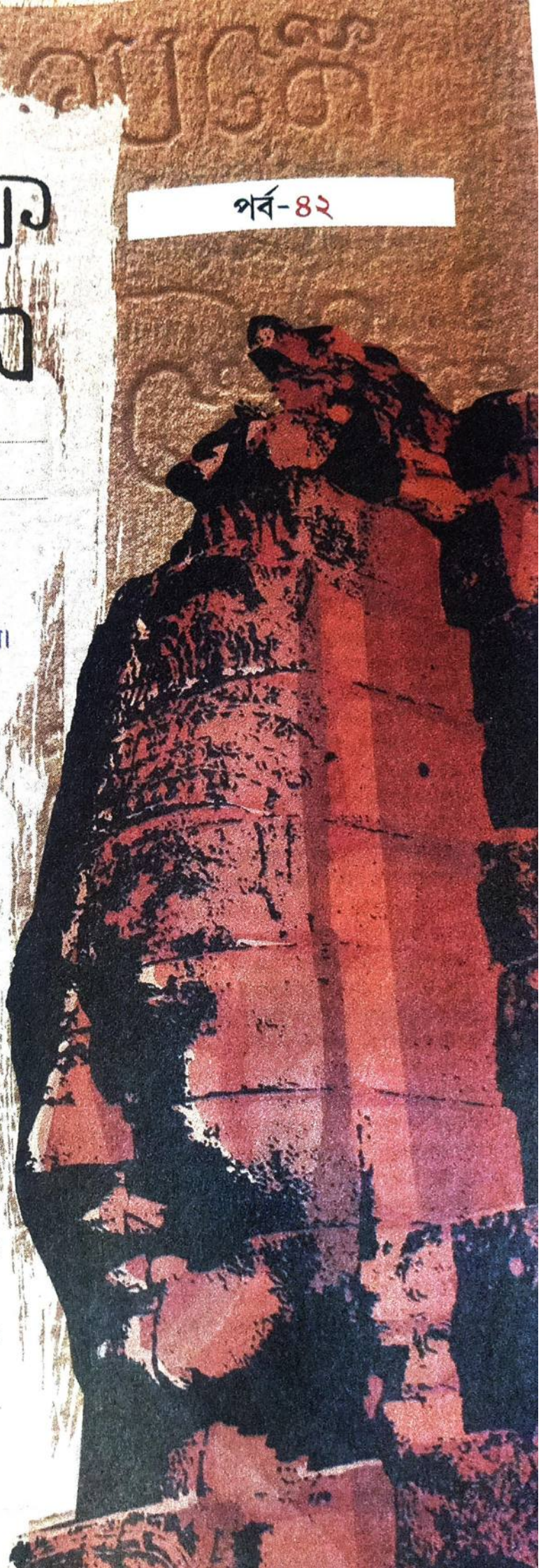

**আগে যা ঘটেছে...**

**পরদিন যথা নিয়মে ভোরের আলো ফুটল। এই একটা দিন এ প্রাসাদে কাটিয়ে যেভাবেই হোক চম্পাকে পরদিন প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে। সকাল-দুপুর নিজ কক্ষেই রইল চম্পা।**

সে চলে যাওয়ার পর দ্বার বন্ধ করে হাতজোড় করে চম্পা দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল, 'হে ভগবান বিষ্ণু, হে মহাদেব নটরাজ তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যাতে আমার পরিকল্পনা সার্থক হয়, আমি যেন মুক্তি লাভ করতে পারি এই স্থান থেকে, যেন মিলিত হতে পারি আমার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে।'

সেদিন সন্ধ্যা নামার পরও যথারীতি ডাক এল চম্পার। একটানা কথাগুলো বলে থামল খামের যুবতী। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি আরও খানিকটা কমে এসেছে। মেঘ কেটে চাঁদ আত্মপ্রকাশ করেছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চত্বরে, প্রাচীন মন্দির তোরণের মাথার ওপর বিষ্ণুর মুখমণ্ডলে। খামের যুবতীর মুখেও চাঁদের আলো এসে পড়ছে। চুল থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে খামের যুবতীর মুখে, পোশাক ভিজে লেপ্টে আছে শরীরের সঙ্গে। স্বাগত খেয়াল করল সিক্ত বসনা যুবতীকে চাঁদের আলোতে সুন্দরী দেখালেও তার চোখেমুখে যেন শঙ্কার ভাব জেগে আছে।

তবে বৃষ্টি থামতে চললেও ব্যাঙের ডাকের বিরাম নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙ উল্লসিত কলরব করে চলেছে। চত্বরের দিকে ভালো করে দেখে নেওয়ার পর সে আবার বলতে শুরু করল— 'নৃত্যকক্ষে প্রবেশ করল চম্পা। দেখল উগ্রদেবের অতিথিরা ইতিমধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হয়ে মদ্যপান শুরু করে দিয়েছে। তবে গৃহস্বামী সে স্থানে উপস্থিত নেই। সম্ভবত তিনি বিষ্ণুলোক থেকে নিজ প্রাসাদে ফেরেননি। চামেদের মধ্যে আরও একজন ব্যক্তি সেই কক্ষে অনুপস্থিত। সে হল কালচক্র।

চম্পা উপস্থিত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে নৃত্য প্রদর্শন

শুরু করল। তার নৃত্য উপভোগ করতে করতে মদিরা পান করে চলল চামেরা। চম্পা খেয়াল করল আজ চামেদের মধ্যে মদিরা পানের প্রবণতা বেশি। যেন কোনও ঘটনার উদ্‌যাপন ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে তারা। পরদিন মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণের জন্মোৎসব। কিন্তু সে কারণে তাঁর চিরশত্রু চামেদের মনে উৎফুল্ল ভাব কেন প্রকাশ পাবে তা বুঝে উঠতে পারল না চম্পা। নেচে চলল সে। একের পর এক স্ফটিকের পানপাত্র শূন্য করতে করতে নিজেদের মধ্যে চটুল অসংলগ্ন বাক্য বিনিময় করতে লাগল তারা। সে খেয়াল করল চামেদের মধ্যে একজন লোলুপ দৃষ্টিতে তার নৃত্যরত ঘর্মাক্ত শরীরের দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে জিভ চাটছে। রাত যত বাড়তে লাগল চামেদের নেশার ঘোর, অসংলগ্ন আচরণ তত বৃদ্ধি পেতে লাগল। আসনে বসে তারা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। রাত আরও গভীর হল। হঠাৎ একজন চাম, চম্পাকে নির্দেশ দিল, 'এবার তুই থাম। শুধু নৃত্য দেখতে আর ভালো লাগছে না।'

থেমে গেল চম্পা। বাদ্যকাররাও থেমে গেল।

অপর একজন নির্দেশ দিল, 'তোরা সবাই যারা এ কক্ষে আছিস তারা বাইরে যা।' এ নির্দেশ পেয়ে খুশিই হল সবাই, রাত অনেক হয়েছে। সবাই কক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করল। চম্পাও কক্ষ ত্যাগ করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় একজন চাম চম্পার উদ্দেশে বলল, 'নর্তকী তুই এখানেই থাক।'

এ লোকটা সেই লোক যে এতক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল চম্পার দিকে। নির্দেশ মেনে চম্পা দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য সবাই কক্ষ ত্যাগ করল। সেই চাম এবার টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে চম্পাকে বলল, 'কাছে আয়, তোকে আমার চাই। শুধু তোর নাচ দেখে আমার মন ভরছে না।'

লোকটার মনের ইচ্ছা অনুমান করে প্রমাদ গুনল চম্পা। সে বুঝে উঠতে পারল না ছুটে কক্ষের বাইরে যাবে কি না। কিন্তু উগ্রদেবের অতিথিরা অসন্তুষ্ট হলে তিনি যদি কুপিত হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন বা এমন অন্য কোনও শাস্তির বিধান দেন, যাতে পরদিন তার এ প্রাসাদ থেকে পালাবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়! সে ভয়েই কক্ষ ত্যাগ করতে পারল না চম্পা। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার আহ্বানে সাড়া না দেওয়াতে সে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল নিজেই চম্পাকে আলিঙ্গন করার জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে চম্পার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে লোকটার উদ্দেশে করজোড়ে বলল, 'আমাকে মার্জনা করবেন। আমি নর্তকী, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও প্রভু উগ্রদেবের অনুমতি ছাড়া আমি কারও সঙ্গে মিলিত হতে পারি না। অনুমতি সংগ্রহ হলে আগামী কাল রাতে নিশ্চয়ই আমি আপনার ইচ্ছাপূরণ করব।'

লোকটা তবুও তার দিকে এগতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পাশে বসা অন্য একজন চাম তার হাতটা চেপে ধরল। সে হয়তো বুঝতে পারল সঙ্গী যে কাজটা করতে যাচ্ছে, সে কাজের উপযুক্ত সময় এটা নয়। লোকটা তার কামার্ত সঙ্গীকে বলল, 'উগ্রদেব হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন। আজকের রাতটা অপেক্ষা কর তুমি। তিনি নিশ্চয়ই কাল তোমার ইচ্ছাপূরণে বাধা দেবেন না।'

অন্য একজন বলল, 'হ্যাঁ, কাল থেকে এ রাজ্যের সব কিছু তো আমাদেরই।'

এরপর তৃতীয় একজন চাম মদিরার নেশাতে জড়ানো গলাতে যে কথাটা বলে ফেলল তা শুনে চমকে উঠল চম্পা। লোকটা বলল, 'কাল এতক্ষণে রাজমুকুট পরে ফেলেছেন উগ্রদেব। কালচক্রের তির লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয় না। সে তির বিষ্ণুলোকে সন্ধ্যা নামার আগেই বিদ্ধ হবে ধরণীন্দ্রবর্মণের বক্ষে। আমাদের নতুন মহারাজ উগ্রদেব নিশ্চয়ই আমাদের যেকোনও অনুরোধ রক্ষা করবেন কাল। এই সামান্য নারীকে নিশ্চয়ই লাভ করব আমরা।'

লোকটা কথাগুলো চামদেশীয় ভাষায় বললেও দীর্ঘকাল তাদের দেশে থাকার কারণে তার কথা চম্পার বুঝতে অসুবিধা হল না। শিহরন খেলে গেল তার শরীরে। সে চামেদের আগমনের কারণ বুঝতে পারল। তাদের সাহায্যে মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণকে হত্যার ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন উগ্রদেব!

তবে সঙ্গীদের নিষেধ শুনে সেই কামার্ত চাম আর চম্পার দিকে এগল না। সে চম্পাকে বলল, 'ঠিক আছে এখন তুই যা তবে কাল রাতে তুই আমার।'

চম্পা আর বিলম্ব করল না। প্রমোদকক্ষ ত্যাগ করে কোনওক্রমে সে তার কক্ষে ফিরে এল। উত্তেজনায় তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণ তার প্রাণরক্ষাকারী। চম্পা তাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করে। তাঁকেই হত্যা করতে চলেছেন উগ্রদেব! চম্পার পরিকল্পনা যদি সফল হয় তবে ততক্ষণে সে বহ্নির সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে চন্দ্রালোকিত সমুদ্রপথে। এ দেশের সঙ্গে বা মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণের সঙ্গে আর কোনও সংস্রব না থাকারই কথা। কিন্তু মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণ তো তার প্রাণরক্ষা করেছেন। সেই কৃতজ্ঞতা চম্পা ভুলবে কীভাবে? তাঁর জীবন রক্ষার চেষ্টা করাও কি চম্পার কর্তব্য নয়? সারারাত ধরে ভাবার পর চম্পা শেষে সিদ্ধান্ত নিল, পরদিন বহ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সে ব্যাপারটা তাকে জানাবে। তারা নগরী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে বহ্নি যদি কোনওভাবে এই সংবাদ মহারাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারে তবে মহারাজের প্রাণরক্ষা করা যাবে।' এই বলে মুহূর্তের জন্য থামল খামের যুবতী।

স্বাগত খেয়াল করল চাঁদের আলোতে দ্রুত তার কাহিনি শোনাতে শোনাতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে খামের যুবতীর মুখমণ্ডল। যেন কোনও একদিন সে নিজেই সাক্ষী ছিল ওই ঘটনার!

যুবতী আবার বলতে শুরু করল— 'রাত কেটে গিয়ে পরদিন ভোরের আলো ফুটল। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে আষাঢ় পূর্ণিমার দিন। নিজ কক্ষেই রইল চম্পা। আর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই বদ্ধ কক্ষে বসেই শুনতে পেল প্রাসাদের বাইরে থেকে ভেসে আসা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। সকাল হতেই নগরীর নানা প্রান্ত থেকে প্রজারা বেরিয়ে

পড়েছে প্রজাহিতৈষী মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণের জন্মোৎসব পালনের জন্য। নগর পরিক্রমা করে তারা গিয়ে উপস্থিত হবে বিষ্ণুলোক তোরণের সামনে। বিকালবেলায় মহারাজ ধরণীন্দ্রবর্মণ প্রজাদের দর্শন দেবেন, তাদের আশীর্বাদ করবেন।

সময় এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু চম্পার মনে হচ্ছিল এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা প্রহর। কখন বিকাল হবে? মধ্যাহ্নের ঠিক আগে প্রাসাদের বাইরে বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে সে শব্দ দূরে সরে যেতে লাগল। চম্পা তা শুনে অনুমান করল উগ্রদেব প্রাসাদ ত্যাগ করে বিষ্ণুলোকের দিকে রওনা হলেন মহারাজের জন্মোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য, বলা ভালো মহারাজকে হত্যার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য। কথাটা ভেবেই চম্পা শিউরে উঠল।

দুপুর হল। মধ্য দুপুরে প্রাসাদের ঠিক বাইরে থেকে ভেসে আসতে লাগল অশ্বের ডাক, লোকজনের কণ্ঠস্বর, নানা ধরনের শব্দ। চম্পা বুঝতে পারল উগ্রদেবের নির্দেশ মতো তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষী ও সৈন্যরাও এবার বিষ্ণুলোকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সে সময় হঠাৎ তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই সে দেখল যে রক্ষী তাকে রোজ সন্ধ্যায় প্রমোদ কক্ষে নিয়ে যায়, সে এসে উপস্থিত হয়েছে। চম্পার মনের ভাব তার মুখে ফুটে না উঠলেও তাকে দেখে চম্পার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। এ সময় চামেদের মনোরঞ্জনের জন্য যেতে হবে নাকি? বিকাল হতে বেশি দেরি নেই আর। চামেদের মনোরঞ্জন করতে গেলে তো আর তার প্রাসাদ থেকে পালানো হবে না! রক্ষীর পরনে আজ নতুন সাজ-পোশাক, কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলছে। সে চম্পাকে বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আমি তোমাকে নৃত্যকক্ষে নিয়ে যেতে আসব না। উগ্রদেবের নির্দেশে এখনই বিষ্ণুলোকের দিকে রওনা হব আমরা। সন্ধ্যা নামার পর তুমি নিজেই গিয়ে উপস্থিত হবে প্রমোদকক্ষে। অতিথিদের মনোরঞ্জনের যেন কোনও ত্রুটি না হয়।' এ কথা বলে সে চলে গেল। মনের শঙ্কা দূর হল চম্পার। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের হ্রেষারব, সৈনিকদের চিৎকার, সম্মিলিত পদচারণার শব্দ প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে রওনা হল। রক্ষী চলে যাওয়ার পর যে ভৃত্য ফুলমালা আনে সে এল। তার পরনেও নতুন পোশাক। চম্পা মিষ্টি হেসে তার পোশাকের প্রশংসা করতে সে জানাল যে বিষ্ণুলোকে উৎসব দেখতে যাচ্ছে। প্রাসাদের অনেক ভৃত্য-দাসীরাও নাকি বিষ্ণুলোকে যাচ্ছে।

সেই ভৃত্য চলে যাওয়ার পর চম্পা নতুন পোশাকে আর ফুলমালাতে সাজিয়ে তুলতে লাগল নিজেকে। তার মনে হল উৎসবের দিনে সকলের মতো তারও সজ্জিত হওয়া দরকার। তাহলে কেউ তার সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করবে না।

বিকাল হল এক সময়। ইতিমধ্যে সমস্ত প্রাসাদ যেন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কেউ যেন! কিন্তু সেই উত্তেজনা বাইরে প্রকাশ করলে চলবে না। যথাসম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রেখে কক্ষ ত্যাগ করল চম্পা। প্রাসাদের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজতে লাগল বাইরে যাওয়ার জন্য। হঠাৎই এক অলিন্দে এক দাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল তার। দাসী প্রমোদ কক্ষে অতিথিদের মদ্য পরিবেশন করে। চম্পা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার পথ কোনটা?'

দাসী অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কোথায় যাবে?' মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল চম্পাকে। সে বলল, 'প্রভু উগ্রদেব নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমাকে বিষ্ণুলোকে নৃত্য প্রদর্শন করতে যেতে হবে। সেই স্থানেই আমি নৃত্য প্রদর্শন করতাম কি না। একজন ভৃত্য এসে সে খবর জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে।' তবুও সেই দাসী চুপ করে রইল। সে বুঝে উঠতে পারল না প্রাসাদের বাইরে বেরবার পথ তাকে জানানো উচিত হবে কি না! তাকে চুপ করে থাকতে দেখে চম্পা ধমকের স্বরে বলল, 'পথ কোনটা বল? প্রাকার তোরণের বাইরে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অশ্ব শকট এসেছে। আমার যেতে বিলম্ব হলে প্রভু উগ্রদেব ক্রুদ্ধ হবেন। আমি তখন বিলম্বের কারণ হিসাবে তোমার কথা বলব। আমি বিষ্ণুলোকে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে নৃত্য প্রদর্শন না করতে পারলে প্রভু তোমাকে কুমিরের মুখে ছুড়ে ফেলে দেবেন।'

চম্পা এত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলল যে,

চম্পা এত দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলল যে, দাসী ভয় পেয়ে তাকে প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল। তোরণে দ্বাররক্ষী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চম্পাকে পথ ছেড়ে দিল। চম্পা বুঝতে পারল আগেই তাকে বশীভূত করে রেখেছে খড়্গ।

দাসী ভয় পেয়ে তাকে প্রাসাদের বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল। তোরণে একজন দ্বাররক্ষী বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে চম্পাকে পথ ছেড়ে দিল। চম্পা বুঝতে পারল আগেই তাকে বশীভূত করে রেখেছে খড়্গ। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাসাদের বাইরে পা রাখল চম্পা। চারপাশে আর কোনও লোকজন নেই বললেই চলে। তারা সবাই রওনা হয়েছে বিষ্ণুলোকের দিকে। ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করতে করতে বাগিচার মধ্যবর্তী পথ ধরে এগল প্রাকার তোরণের দিকে। সেই স্থানে পৌঁছে গেল সে। প্রধান দ্বাররক্ষী খড়্গ আর তার কয়েকজন অনুচর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। খড়্গর অনুচররা যেন দেখতেই পেল না চম্পাকে। খড়্গ তোরণের সামান্য অংশ ফাঁক করল। বিষ্ণু নাম স্মরণ করে চম্পা উগ্রদেবের প্রাসাদ ত্যাগ করার সময়

খুকু শুধু চাপা স্বরে বলল, 'যত শীঘ্র পার ফিরে এসো। আমি এখানেই থাকব।'

তোরণের বাইরের রাস্তা দিয়ে জনস্রোত ধাবিত হচ্ছে বিষ্ণুলোকের দিকে। চম্পা সেই ভিড়ে মিশে গিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলল বিষ্ণুলোকের দিকে। পথের দু'পাশের পতাকা দণ্ডে উড়ছে রঙিন পতাকা, কোথাও বাদ্যকাররা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, কোথাও বা নৃত্য প্রদর্শন করছে নর্তকীর দল, কোথাও পরমান্ন বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু সে সব দেখার সময় নেই চম্পার। সূর্য ক্রমশ ঢলতে শুরু করেছে আকাশের বুকে জেগে থাকা বিষ্ণুলোকের চূড়াগুলোর দিকে। চম্পাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে সে স্থানে, যে স্থানে তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে বহ্নি।'

খামের সুন্দরী এ পর্যন্ত বলার পরই দূর থেকে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল জানলার কিছুটা তফাতে। সঙ্গে

খামের সুন্দরী এ পর্যন্ত বলার পরই দূর থেকে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল জানলার কিছুটা তফাতে। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী তার কথা থামিয়ে আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'আমার কথা শেষ হল না!' —একথা বলেই সে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আড়ালে।

সঙ্গে যুবতী তার কথা থামিয়ে আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'আমার কথা শেষ হল না!'—একথা বলেই সে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আড়ালে। টর্চের আলোটা এবার ঘুরতে শুরু করেছে জানলার আশপাশে। প্রফেসর রামমূর্তির ঘরের দিক থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে! কে ওখানে?'

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে রামমূর্তি স্যর এগিয়ে আসতে লাগলেন স্বাগতর ঘরের দিকে। স্বাগত মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল খামের যুবতীর উপস্থিতি এই মুহূর্তে প্রফেসরের কাছে নিজে থেকে প্রকাশ করা উচিত হবে না। জানলার কাছ থেকে সরে এসে জানলার দিকে পিছন ফিরে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। প্রফেসর এসে জানলার বাইরে থেকে আলো ফেললেন ঘরের ভিতর। তারপর বেশ কয়েকবার হাঁক দিলেন তার নাম ধরে। ডাক শুনেই যেন ঘুম ভাঙল এমনভাবে বিছানায় উঠে বসল স্বাগত। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়াল স্বাগত। তখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে চলেছে। রামমূর্তি তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কাউকে দেখেছ? তোমার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল একজন। সম্ভবত একজন নারী। আমি আমার ঘরের জানলা দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে বাইরে বেরিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই সে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।'

স্বাগত জবাব দিল, 'আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম স্যর।'

উত্তর শুনে আর কোনও কথা না বলে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগলেন ঘরের পিছন দিকে। স্বাগতও তাঁকে অনুসরণ করল। না, ঘরের পিছন দিকে কারও সন্ধান মিলল না। তারা আবার সামনে ফিরে এল। তাদের কথাবার্তার শব্দ শুনে ইতিমধ্যে প্রীতমও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে স্যর?'

রামমূর্তি তার প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রীতমের হাতেও টর্চ। সে আর রামমূর্তি আলো ফেলতে লাগলেন চারপাশে জঙ্গলের দিকে, চত্বরের যে সব জায়গাতে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে না সে জায়গাগুলোতে। স্বাগতদের পাশাপাশি তিনটে ঘরের মধ্যে একফালি করে জায়গা আছে। প্রীতমের টর্চের আলো ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই থেমে গেল নাতাশাদের ঘর সংলগ্ন সেই জায়গায় মুখে। কী যেন একটা নড়ে উঠল সেখানে। রামমূর্তিও আলো ফেললেন সেখানে। এরপরই সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন। তবে সে মানুষ নয়, মন্দিরের ভিতর যে বিশাল বাঁদরিটা থাকে সেটা! সর্বাঙ্গ তার জলে ভেজা। লোমগুলো লেপ্টে আছে শরীরের সঙ্গে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই টর্চের উজ্জ্বল আলোতে সম্ভবত চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। কয়েক মুহূর্ত সে একইভাবে বসে রইল। তারপর লম্বা লম্বা লাফ মেরে স্বাগতদের কিছুটা তফাত দিয়ে এগল মন্দির তোরণের দিকে। এরপর সে একবার পিছনে তাকিয়ে সম্ভবত দেখার চেষ্টা করতে লাগল স্বাগতরা তাকে অনুসরণ করছে কি না? তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল তোরণের ভিতর। প্রীতম এবার হেসে বলল, 'স্যর, সম্ভবত এই বাঁদরিটাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন আপনি।'

প্রফেসর স্বগতোক্তি করলেন, 'কিন্তু বাঁদরিটা বৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে ভিজছিল কেন? আর এদিকে এসেছিলই বা কেন?'

প্রীতম বলল, 'হয়তো বা খাবারের সন্ধানে।'

প্রফেসর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা এখন ঘরে যাও।'—এই বলে তিনি নিজের ঘরের দিকে এগলেন।

স্বাগত ঘরে ঢুকে পড়ল। জামা খানিকটা ভিজে গিয়েছে। সেটা খুলে সে জানলার দিকে চোখ রেখে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগল নিমেষের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল সেই খামের যুবতী? এই প্রবল বর্ষার মধ্যেও সে তার গল্প শোনাতে এসেছিল কেন? এ কাহিনি স্বাগতকে শোনাবার জন্য তার এত প্রবল আগ্রহ কেন? এই মন্দিরের সঙ্গে সে গল্পের সম্পর্ক আছে বলেই কি? সে কি আবার আসবে? এ সব প্রশ্ন আর তার বলে যাওয়া গল্পের অংশর কথা ভাবতে স্বাগত ঘুমিয়ে পড়ল।

## তেইশ

স্বাগতর যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল প্রায় সাতটা। শেষ রাতের দিকে ঘুমাবার কারণে ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙেনি।

তার ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কাবার শব্দে আর সুরভীর ডাকে। স্বাগত বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলতেই সুরভী বেশ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'নাতাশাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ওর মোবাইল ফোন ঘরেই রাখা।'

স্বাগত বলল, 'খুঁজে পাচ্ছ না মানে?'

সুরভী বলল, 'আলো ফোটার পর পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভেঙে দেখি নাতাশা বিছানাতে নেই। ভাবলাম সে হয়তো টয়লেট গিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে যখন ঘরে এল না তখন আমি বাইরে এলাম। চারপাশে খুঁজে দেখলাম। কিন্তু তাকে দেখছি না।'

ঝলমলে সকাল। আকাশে মেঘ কেটে গিয়েছে। যদিও সবুজ জঙ্গলের ভিতর থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। প্রফেসরের ঘরের দিকে একবার তাকাল স্বাগত। তার ঘর বন্ধ। তারপর সে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাতাশা সামনে কোথাও হাঁটতে যায়নি তো?'

সুরভী বলল, 'মনে হয় না। সে তো একলা কোথাও যায় না। জানোই তো সে সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে। আমি চত্বরের সব জায়গা খুঁজলাম, আমাদের ঘরগুলোর পিছনেও দেখলাম, কিন্তু সে নেই।' কথাগুলো বলতে বলতেই সুরভীর মুখমণ্ডলে একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল।

প্রীতমদের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। স্বাগত গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে প্রীতম আর বিক্রম বাইরে বেরিয়ে এল। স্বাগত তাদের কথাটা বলল। সে কথা শুনে বিক্রম একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাল মাঝ রাতে প্রীতম যখন বাইরে থেকে ঘরে ঢুকল তখন দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে আমার ঘুমটা খানিকক্ষণের জন্য ভেঙে গিয়েছিল। প্রীতম বিছানায় শুয়ে পড়ল, আর আমি জানলার দিকে পাশ ফিরে শুলাম। তারপর আমার চোখে আবার ঘুম নেমে আসছিল। আমি যেন তখন দেখলাম একজন চত্বর থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। তাকে দেখে আমার মেয়ে বলেই মনে হল। তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তবে জানি না ঘুম চোখে আমি ভুল দেখেছি কি না।'

সে কথা শেষ করা মাত্রই সুরভী প্রীতমকে জিজ্ঞেস করল, 'মাঝরাতে তুমি বাইরে বেরিয়েছিলে কেন?'

প্রীতম বলল, 'প্রফেসর আর স্বাগতর কথাবার্তার শব্দ শুনে।'

স্বাগত এবার গত রাতে প্রফেসর কেন বাইরে বেরিয়ে তার কাছে এসেছিলেন সে কথা বলল সুরভীকে। বিক্রমেরও ঘটনাটার কথা জানা ছিল না। সে বলল, 'তাহলে হয়তো আমি ঠিকই দেখেছি। রামমূর্তি স্যর গতকাল রাতে যাকে দেখেছেন সে নাতাশাই হবে।'

সুরভী এবার বেশ জোর দিয়ে বিক্রমকে বলল, 'তুমি যদি কোনও মেয়েকে সত্যি দেখে থাক, তবুও সে কিছুতেই নাতাশা হতে পারে না। যে মেয়ে দিনের বেলা একলা এই চত্বরে থাকতে চায় না, সে মাঝরাতে জঙ্গলের দিকে যাবে?'

সুরভীকে প্রীতম জিজ্ঞেস করল, 'কাল তুমি ওর আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছ?'

সুরভী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সকালে ওই খুনের ব্যাপারটা শুনে সে আরও খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারার পর ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার মনে হল সে যেন ভয়টা বেশ খানিকটা কাটিয়ে উঠেছে। বৃষ্টি নামার কারণে আমরা আর বাইরে বেরয়নি। বিকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমরা নানা বিষয় নিয়ে গল্প করেই কাটিয়েছিলাম। সে সময় একবারও সে খুন বা ভয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি। বরং অন্যদিন সন্ধ্যা নামলেই তার মনে একটা আতঙ্ক তৈরি হয় আমি দেখেছি। কিন্তু কাল সে একদম স্বাভাবিক ছিল।'

স্বাগত এবার বলল, 'তাকে যখন এখানে দেখা যাচ্ছে না, তখন জঙ্গল আর রাস্তায় খুঁজে দেখি পাওয়া যায় কি না। প্রফেসরও তো ঘরে নেই দেখছি। নাতাশা তাঁর সঙ্গে হাঁটতে বা কোথাও যায়নি তো?'

স্বাগতর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চত্বর থেকে নেমে জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করল সবাই। পথের পাশে রাস্তায় খানাখন্দে গতরাতের বৃষ্টির জল জমে আছে। রাতভর বৃষ্টির পর সকালের ঝলমলে আলোর স্পর্শে পাখিরা আনন্দে মেতে উঠেছে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে মাঝে মাঝে নাতাশার নাম ধরে হাঁক দিতে দিতে সিয়েমরিপ ও বিষ্ণুলোকে যাওয়ার সরল রৈখিক পথে উঠে এল তারা। দু-পাশে রাস্তাটা বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু নাতাশাকে দেখতে পেল না তারা। বড় রাস্তা থেকে পথটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে স্বাগত যেখানে খামের যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় সেদিকে গিয়েছে, অর্থাৎ হোয়াঙের দেহ জঙ্গলের যে অংশে পাওয়া গিয়েছিল সেদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে বিক্রম বলল, 'চল ওদিকটাও একবার দেখে আসি।'

সবাই এগল সেদিকে। সে জায়গায় প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে স্বাগতরা দেখল প্রফেসর রামমূর্তি সেদিক থেকেই আসছেন। পথের মাঝখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সকলের। তিনি স্বাগতকে বললেন, 'একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তোমরাও কি হাঁটতে বেরিয়েছ নাকি?'

সুরভী বলল, 'না স্যর, নাতাশাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তাকে খুঁজছি।'

'খুঁজে পাচ্ছ না মানে?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর।

সুরভী সংক্ষেপে ব্যাপারটা ব্যাক্ত করল তাঁর কাছে।

রামমূর্তি বললেন, 'কিন্তু ওদিকে তো সে নেই। আমি ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওদিকে একটা পাথরের ওপর বসেছিলাম।' প্রফেসরের কপালে যেন চিন্তার ভাঁজ খেলে গেল। স্বাগতকে তিনি বললেন, 'কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সে নাতাশা নয় তো?'

স্বাগত চুপ করে রইল। প্রফেসর বললেন, 'চল তো একবার চারপাশটা ভালো করে খুঁজে দেখি?' মন্দির চত্বর সংলগ্ন জঙ্গলের পথ ধরে নাতাশাকে খুঁজতে খুঁজতে তার নাম ধরে হাঁক দিতে লাগল সবাই। *(চলবে)*

# আইপিএল নিলামে ঋষভের ইতিহাস

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কাকভোরেই গোটা ক্রিকেট দুনিয়ার হৃৎপিণ্ড প্রায় গলায় চলে এসেছিল। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ঋষভ পন্থ। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে তো বাঁচার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তড়িঘড়ি ভারতীয় সুপারস্টারকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাঁটু পুরোপুরি টুইস্ট, লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে— ডাক্তাররা প্রাথমিকভাবে পা কেটে বাদ দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তবে তার দরকার পড়েনি। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রার্থনায় ঋষভ প্রাণে বাঁচলেও তাঁর ক্রিকেটে ফেরার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। কিন্তু ভারতীয় তারকা উইকেটরক্ষক ব্যাটার যে যোদ্ধা। হারের আগে হারতে শেখেননি। হাসপাতালেই চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন, 'সুস্থ হতে কতদিন সময় লাগবে?' জবাব আসে, অন্তত ১৬ থেকে ১৮ মাস।' বিছানায় শুয়েই ঋষভ বলেছিলেন, 'মিলিয়ে নেবেন, ১২ মাসের মধ্যেই পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরব।' শুধু মুখে বলা নয়, তা কাজে করেও দেখিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী ক্রিকেটার। গত বছর আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানোতেও বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। আর সম্প্রতি আইপিএল নিলামেও সমস্ত রেকর্ড চুরমার করে দিয়েছেন তারকা ক্রিকেটার। ২৭ কোটি দরে ক্রোড়পতি লিগের ইতিহাসের দামি ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ। সত্যিই এ যেন রূপকথা!

এবার পন্থকে রিটেইন করেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। তখনই বোঝা গিয়েছিল, আইপিএলের নিলামে ঝড় উঠতে চলেছে। সৌদি আরবের জেড্ডায় ঋষভের নাম উঠতেই সে কী উন্মাদনা। অনুরাগীরা প্রিয় টিমের পতাকা উঁচিয়ে যেন জানান দিচ্ছিলেন, 'যে কোনও মূল্যে ঋষভকে দলে চায়।' শেষ পর্যন্ত ২০.৭৫ কোটিতে লখনউ সুপার জায়ান্টসের পক্ষে তারকা ক্রিকেটারের দর থামে। কিন্তু তখনও লড়াই শেষ হয়নি। পন্থের প্রাক্তন দল দিল্লি ক্যাপিটালসের হাতে 'আরটিএম' ছিল। ক্যাপ্টেনকে ফিরে পেতে প্রত্যাশিতভাবেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে আগ্রহী দেখাল সৌরভ গাঙ্গুলি, পার্থ জিন্দালদের। জবাবে লখনউয়ের শেষ দর ২৭ কোটি। আর তাতেই বাজিমাত। এই বিপুল অঙ্ক দিয়ে পন্থকে নিতে আর রাজি হয়নি দিল্লি। 'সোল্ড টু লখনউ সুপার জায়ান্টস' ঘোষণা হতেই আইপিএল নিলামের যাবতীয় রেকর্ড চুরমার। পন্থের আগে অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য আইপিএলের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের তকমা জুটেছিল শ্রেয়স আয়ারের। ২৬.৭৫ কোটিতে তাঁকে দলে নেয় পাঞ্জাব কিংস। আসলে গতবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স। আর নিলামে বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজিই দক্ষ নেতার খোঁজে ছিল। তাছাড়া শ্রেয়সের সাম্প্রতিক ফর্মও উজ্জ্বল। বেঙ্কটেশ আয়ারকে বিপুল পরিমাণ টাকায় (২৩.৭৫ কোটি) নেয় কেকেআর। এছাড়া অর্শদীপ সিং ও যুজবেন্দ্র চাহালও ১৮ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছেন। পন্থের বিকল্প হিসেবে ১৪ কোটি টাকায় লোকেশ রাহুলকে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এছাড়া ১১.৭৫ কোটিতে মিচেল স্টার্ক ও ১০.৭৫ কোটিতে টি নটরাজনকে নেওয়ার পাশাপাশি জেক ফ্রেজারকেও 'আরটিএম' করেছে তারা। ১০ কোটি টাকায় মহম্মদ সামিকে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ১১.২৫ কোটি টাকায় ঈশান কিষানের ঠিকানাও নিজামের শহর। গুজরাত নিয়েছে জস বাটলার (১৫.৭৫ কোটি), কাগিসো রাবাডাকে (১০.৭৫ কোটি)। ১২.২৫ কোটির বিনিময়ে মহম্মদ সিরাজকেও নিয়েছে তারা।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক ২০২৫ আইপিএলের জন্য কোন টিম কেমন দল গড়েছে?

## কলকাতা নাইট রাইডার্স — স্কোয়াড- ২১

• **রিটেইন তালিকা**- রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন, হর্ষিত রানা, রমনদীপ সিং।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- বেঙ্কটেশ আয়ার, আনরিখ নর্তজে, কুইন্টন ডি'কক, অংক্রিশ রঘুবংশী, স্পেনসার জনসন, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, মঈন আলি, বৈভব আরোরা, রভম্যান পাওয়েল, অজিঙ্কা রাহানে, উমরান মালিক, মণীশ পান্ডে, অনুকূল রয়, লাভনিথ সিসোদিয়া ও মায়াঙ্ক মারকান্ডে।
**সবচেয়ে দামি**- বেঙ্কটেশ আয়ার (২৩.৭৫ কোটি)।

## চেন্নাই সুপার কিংস — স্কোয়াড-২৫

• **রিটেইন তালিকা**- ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, রবীন্দ্র জাদেজা, মাথিশা পাথিরানা, শিবম দুবে, মহেন্দ্র সিং ধোনি।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- নুর আহমেদ, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ডেভন কনওয়ে, খলিল আহমেদ, রাচীন রবীন্দ্র, অনশুল কাম্বোজ, রাহুল ত্রিপাঠি, স্যাম কারান, গুরজাপনিত সিং, নাথান এলিস, দীপক হুডা, জেমি ওভার্টন, বিজয় শঙ্কর, ভানস বেদি, আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, রামকৃষ্ণ ঘোষ, শেখ রশিদ, মুকেশ চৌধুরি, কমলেশ নাগারকট্টি ও শ্রেয়স গোপাল।
**সবচেয়ে দামি**- রবীন্দ্র জাদেজা (১৮ কোটি) ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি)।

## দিল্লি ক্যাপিটালস — স্কোয়াড- ২৩

• **রিটেইন ক্রিকেটার**- অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, ট্রিস্টান স্টাবস, অভিষেক পোড়েল।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- লোকেশ রাহুল, মিচেল স্টার্ক, টি নটরাজন, জেক ফ্রেজার, মুকেশ কুমার, হ্যারি ব্রুক, আশুতোষ শর্মা, মোহিত শর্মা, ফাফ ডু' প্লেসি, সমির রিজভি, ডোনাভান ফেরেইরা, দুষ্মন্ত চামিরা, ব্রিজপ নিগম, করুন নায়ার, মানবন্ত কুমার, দর্শন নালকান্দে, অজয় মন্ডল, ত্রিপূর্ণ বিজয়, মাধব তিওয়ারি।
**সবচেয়ে দামি**- অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি)।

## মুম্বই ইন্ডিয়ান্স — স্কোয়াড- ২৩

• **রিটেইন তালিকা**- যশপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, তিলক ভার্মা।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহার, নমন ধীর, উইল জ্যাকস, আল্লাহ গজনফর, মিচেল স্যান্টনার, রায়ান রিকেলটন, রিস টপলে, লিজাড উইলিয়ামস, রবিন মিনজ, করণ শর্মা, ভিগনেশ পুথুর, বেভন জ্যাকস, সত্যনারায়ণ রাজু, রাজ বাওয়া, অশ্বিনী কুমার, অর্জুন তেন্ডুলকর, কৃষ্ণাণ শ্রীজিত।
**সবচেয়ে দামি**- যশপ্রীত বুমরাহ (১৮ কোটি)।

## রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু — স্কোয়াড- ২২

• **রিটেইন তালিকা**- বিরাট কোহলি, রজত পাতিদার, যশ দয়াল।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- জস হ্যাজলউড, ফিল সল্ট, জিতেশ শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, লিয়াম লিভিংস্টোন, রাশিখ সালাম, ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, সুয়াশ শর্মা, জেকব বেথহেল, দেবদূত পাদিক্কাল, নুয়ান তুষারা, রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডি, স্বপ্নিল সিং, অভিনন্দন সিং, স্বস্তিক চিকারা, মোহিত রাঠি, মনোজ ভানডাগে।
**সবচেয়ে দামি**- বিরাট কোহলি (২১ কোটি)।

## লখনউ সুপার জায়ান্টস — স্কোয়াড- ২৪

• **রিটেইন তালিকা**- নিকোলাস পুরান, মায়াঙ্ক যাদব, রবি বিষ্ণোই, আয়ুষ বাদোনি, মহসিন খান।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- ঋষভ পন্থ, আভেশ খান, আকাশ দীপ, ডেভিড মিলার, আব্দুল সামাদ, মিচেল মার্শ, শাহবাজ আহমেদ, আইডেন মার্কাম, সামারো জোসেপ, মানিমারন সিদ্ধার্থ, ম্যাথিউ ব্রিটকে, অর্শিন কুলকার্নি, দিগভিশ সিং, প্রিন্স যাদব, যুবরাজ চৌধুরি, আকাশ সিং, রাজবর্ধন হাঙ্গরগেকর, আরিয়ান জুয়াল, হিম্মত সিং।
**সবচেয়ে দামি**- ঋষভ পন্থ (২৭ কোটি)।

## পাঞ্জাব কিংস — স্কোয়াড- ২৫

• **রিটেইন তালিকা**- শশাঙ্ক সিং, প্রভসিমরণ সিং।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- শ্রেয়স আয়ার, অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, মার্কাস স্টোইনিস, মার্কো জানসেন, নেহাল ওয়াধেরা, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য, জস ইংলিশ, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, লকি ফার্গুসন, বিজয়কুমার বৈশক, যশ ঠাকুর, হরপ্রীত ব্রার, অ্যারন হার্ডি, বিষ্ণু বিনোদ, কুলদীপ সেন, জাভিয়ার বার্টলেট, সূর্যাংশ শেডজে, পায়লা অবিনাশ, মুশির খান, হারনুর সিং ও প্রভীন দুবে।
**সবচেয়ে দামি**- শ্রেয়স আয়ার (২৬.৭৫ কোটি)।

## রাজস্থান রয়্যালস — স্কোয়াড- ২০

• **রিটেইন তালিকা**-যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমেয়ার, সন্দীপ শর্মা।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- জোফ্রা আর্চার, তুষার দেশপান্ডে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহীশ থিকসানা, নীতিশ রানা, ফজলহক ফারুকী, কোয়েন মাফাকা, আকাশ মাধওয়াল, বৈভব সূর্যবংশী, শুভম দুবে, যুধবীর সিং, কুনাল সিং রাঠোর, অশোক শর্মা, কুমার কার্তিকেয়।
**সবচেয়ে দামি**-যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি) ও সঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি)।

## সানরাইজার্স হায়দরাবাদ — স্কোয়াড- ২০

• **রিটেইন তালিকা**- হেনরিখ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, নীতিশ কুমার রেড্ডি।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**- ঈশান কিষান, মহম্মদ সামি, হার্শল প্যাটেল, রাহুল চাহার, অভিনব মনোহর, অ্যাডাম জাম্পা, সিমরজিৎ সিং, এসান মালিঙ্গা, ব্রাইডন কার্স, জয়দেব উনাদকাট, কামিন্দু মেন্ডিস, জিসান আনসারি, অনিকেত ভার্মা, অথর্ব তাওড়ে, শচীন বেবি।
**সবচেয়ে দামি**-হেনরিখ ক্লাসেন (২৩ কোটি)।

## গুজরাত টাইটান্স — স্কোয়াড- ২৫

• **রিটেইন তালিকা**-রশিদ খান, শুভমান গিল, সাই সুদর্শন, শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়া।
**নিলামে কেনা ক্রিকেটার**-জস বাটলার, মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাডা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণন, ওয়াশিংটন সুন্দর, শেরফানে রাদারফোর্ড, জেরাল্ড কর্টজে, গ্লেন ফিলিপস, সাই কিশোর, মহিপাল লোমরোর, গুরনুর ব্রার, আর্শাদ খান, করিম জনত, জয়ন্ত যাদব, ইশান্ত শর্মা, কুমার কুশাগ্রা, নিশান্ত সিন্ধু, মানভ সুতার, অনুজ রাওয়াত, কুলবন্ত খেজরোলিয়া।
**সবচেয়ে দামি**- রশিদ খান (১৮ কোটি)

• সৌগত গঙ্গোপাধ্যায়

# বাল্মীকি প্রতিভা

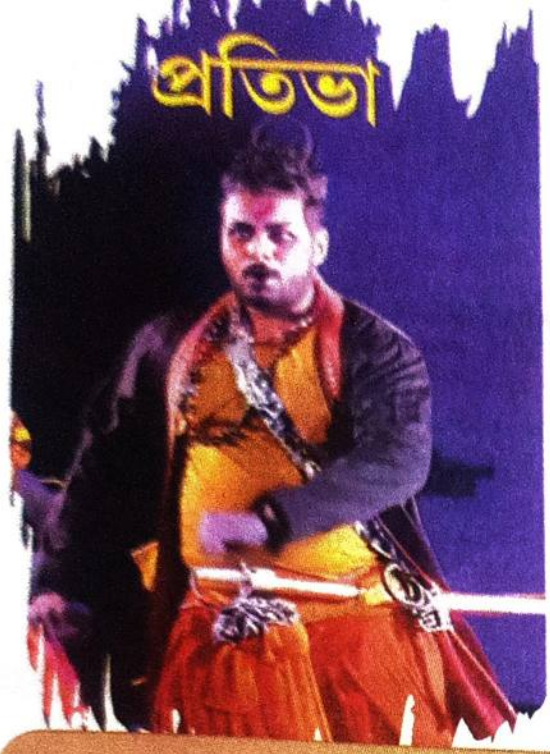

দস্যু রত্নাকর পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন মহর্ষি বাল্মীকি। এই রূপান্তরের কাহিনি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ২০০৮ সাল থেকে দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে সংশোধনাগারের সাজাপ্রাপ্ত আবাসিকদের নিয়ে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করছেন নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে প্রযোজনার শততম পর্বের মঞ্চায়ন হল। প্রেসিডেন্সি, মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন সংশোধনাগারের বাইশজন সাজাপ্রাপ্ত আবাসিক এই নৃত্যনাট্যে অংশ নেন। একদা দস্যু রত্নাকর তার ডাকাতদলের সদস্যদের শিকার ধরে আনতে বলে মায়ের পায়ে বলি দেওয়ার জন্য। পথভ্রষ্ট এক বালিকাকে ধরে নিয়ে যায় ডাকাতরা। মধ্যরাতে মায়ের পায়ে বলি দিতে গিয়ে নিষ্পাপ বালিকার আকুতিতে রত্নাকরের মন পরিবর্তিত হয়। চোখে জল আসে। এই অভিঘাতে পশুহত্যা, রাহাজানি, লুটপাট সবই ছেড়ে দেয়। দেবী সরস্বতীর বরে দস্যু থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তর ঘটে। অলকানন্দা রায়ের নির্দেশনায় শেষবারের মতো পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকরা উপভোগ করলেন নৃত্যনাট্যটি। মার্শাল আর্ট, লোকনৃত্য, ছৌ নাচ, মণিপুরী ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্যটি। দস্যু রত্নাকর, পথভ্রষ্ট বালিকা ও দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে সুমিত, শানুরিতা বেরা ও অলকানন্দা রায়। পোশাক, মঞ্চ ও গান তৈরি করেন বি ডি শর্মা। রত্নাকরের লিপে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। কারাপ্রধান, কারারক্ষী এবং তাঁদের পরিজন ও আবাসিকরা অংশ নেন নৃত্যনাট্যে।

**অপর্ণা তাঁতী**

# সুরের চরণ ধুয়ে

সম্প্রতি আদ্যাপীঠ নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হল ভক্তি গানের আসর 'সুরের চরণ ধুয়ে'। অনুষ্ঠানে নবীন প্রবীণ একঝাঁক শিল্পী ভক্তি রসাশ্রিত গান নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় সুরের আকাশে সংস্থার সঙ্গীত 'মায়ের পায়ে জবা হয়ে' ও 'রামকৃষ্ণ শরণম' গানের মাধ্যমে। সঙ্গীত পরিচালনা করেন রুমা ভট্টাচার্য। এরপর ছিল গান ও কবিতার কোলাজ। অংশগ্রহণ করেন ইন্দ্রাক্ষী ঘোষ বসু ও সুজিত দত্ত। ইন্দ্রাক্ষী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গাইলেন 'আজি বিজন ঘরে' ও 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। গানের সঙ্গে কবিতার মিশ্রণে অনুষ্ঠানটি সুখশ্রাব্য ছিল। সংবর্ধনা জানানো হয় প্রবাসী বাচিক শিল্পী ডঃ লগ্নজিতা বিশ্বাসকে। উর্মি

পাল নিবেদন করেন 'ওই শ্যামা বামাকে' ও 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে' গান দু'টি। এরপর সুস্মিতা দত্ত পরিবেশন করেন 'মাগো তোর দয়াতে' ও 'আয় মন যাই বেড়াতে দক্ষিণেশ্বরে'। তাঁর দরদী পরিবেশন মুগ্ধ করে। প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী কাকলি দেব শোনালেন 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে'। সুজাতা নন্দী গাইলেন 'মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল', কমলিকা ভট্টাচার্য পরিবেশন করলেন 'জগতের নাথ তুমি জননী'। ডঃ লগ্নজিতা বিশ্বাস ও সুজিত দত্ত পরিবেশন করেন 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'। কবিতা পরিবেশন করেন কেয়া ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন অরিন্দম সাধু, রিঙ্কু শীল, চৈতালী মিত্র, রত্না মুখোপাধ্যায়, অসীমনারায়ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

# হাওড়া রত্ন সম্মান

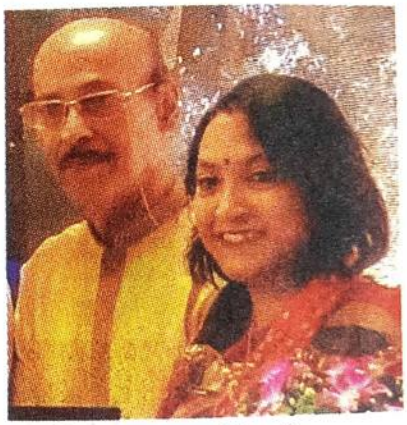

হাওড়ার নক্স রেসিডেন্সিতে এক অনুষ্ঠানে তৃতীয় হাওড়া রত্ন সম্মান ২০২৪ প্রদান করে গীতাঞ্জলি। সংস্থার কর্ণধারদের উপস্থিতিতে সমাজসেবী গৌতম চৌধুরী, বিশিষ্ট আলোকচিত্রী অনুপম হালদার, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, ডাঃ সমীর চ্যাটার্জি, বরুণ সিং প্রমুখের হাত থেকে হাওড়া রত্ন সম্মান পেলেন সুভাষ দত্ত। হাওড়া গর্ব সম্মানে ভূষিত হন অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য, সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী, পাঞ্চালি মুন্সী, অমিত গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিত গাঙ্গুলি ও ইমন চক্রবর্তী।

# সুবিনয় রায়ের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী

সুর-সাধক সঙ্গীত গুরু সুবিনয় রায়ের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে। আনন্দী কমিউনিকেশন সেন্টার ও রূপসা সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠানে সুবিনয় রায়ের উপর একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ।

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেম ও সমাজ বিষয়ে গীতি আলেখ্য মঞ্চস্থ হয়। অংশগ্রহণ করেন অদিতি গুপ্ত, সাগরময় ভট্টাচার্য, ডাঃ সৌম্য ভট্টাচার্য, মানসী রায়চৌধুরী, সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য, শুভাশিস মজুমদার ও ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অদিতি গুপ্ত, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, শুভাশিস মজুমদারে গান। সঙ্গতে ছিলেন তীর্থঙ্কর দেব, গৌতম রায়, রানা দত্ত। স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুবিনয় রায়ের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা সংকলন ও গ্রন্থনায় ছিলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য।

# পূর্ব সিঁথি জাহ্নবীর নিবেদন

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব সিঁথি জাহ্নবীর ১৪তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রকাশিত হল বার্ষিক পত্রিকা। সংস্থার শিল্পীরা স্বর্ণযুগের আধুনিক গানের ভেলায় নিয়ে গেলেন স্বপ্নের ঘাটে। আঞ্চলিক কবিতা ও লোকগান আশ্রয় করে নৃত্য-গীতি-আলেখ্য 'মাটির গহন হতে' পুরুলিয়ার মেঠো সুরে আমোদিত করে। আমন্ত্রিত দল সিক্স এ মিউজিক স্কুল ও মেলোডিকার (সমবেত বাঁশি) পরিবেশনা অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা আনে। শেষে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা— এই তিন নাটকের নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে, রত্না রায় রচিত নৃত্যনাট্য 'কিছু অব্যক্ত আলাপন'। কমলা ডান্স অ্যান্ড মিউজিক অ্যাকাডেমির নৃত্যশিল্পীদের সুন্দর উপস্থাপনা ছিল এটি। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন শ্রাবণী ভট্টাচার্য।

# স্বর্ণযুগের গান

মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানের ডালি নিয়ে অনুষ্ঠিত হল 'গানে গানে স্মরণীয়রা'।

রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে লিপিকা।

অলক রায়চৌধুরী 'তুমি এলে অনেক দিনের পরে' এবং দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় শোনালেন 'কলকাতা কলকাতা', ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 'কাছে যবে ছিল'। সুচিন সিংহ 'খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার' আর বিউটি দাস শোনালেন 'চৈতি ফুলের কি বাঁধিস'। মৃদুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাগলা হাওয়ার', ঈশিতা পানের 'না চাহিলে যারে', ইন্দ্রাক্ষী ঘোষ বসুর 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন' ছিল মনোগ্রাহী নিবেদন। প্রদীপ সিদ্ধার 'এক গোছা রজনীগন্ধা', অরিন্দম সাধুর

'মানুষ খুন হলে পরে', সায়নাভ চক্রবর্তীর 'পথ হারাব বলেই', সুজাতা সাধুর 'না বলে এসেছি', কৃষ্ণা সরকারের 'চিনেছি চিনেছি', চন্দ্রাণী চন্দ্র পালের 'গানে মোর ইন্দ্রধনু'-তে শ্রোতারা মোহিত হন। কাকলি দেবের 'আকাশের অন্তরাগে' শ্রোতাদের নস্টালজিক করে তোলে। আবৃত্তি শোনান তন্দ্রাণী রায়, মল্লিকা রায়। সম্মেলক গানে প্রশংসা কুড়োন তৃষ্ণা দাসের দল সৈকত মিউজিক, সীমা তলাপাত্রের দল বাঁশরী, শিপ্রা পাত্রের সহচরী, ভবানী মান্নার ইন্দ্রধনু ও দেবযানী আচার্যের দল সুর-সঙ্গম। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌ ভট্টাচার্য।

# গ্রন্থ চর্চা

প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তীর উদ্যোগে ইন্দুমতী সভাগৃহে 'গ্রন্থ চর্চা: এই সময়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। সুরঞ্জন মিদ্দে, ঋতম মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ রায়, মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্ক বললেন। সুরঞ্জন মিদ্দে দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ইত্যাদি অঞ্চলের খ্রিস্ট কীর্তনের ধারাকে তুলে ধরেছেন। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কার্ল মার্কস ভাবনা নিয়ে 'কার্ল মার্কস ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য' গ্রন্থ নির্মাণের গল্প শোনা গেল। অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে বলেন ঋতম মুখোপাধ্যায়। মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অবসরের আলাপন' গ্রন্থের নির্মাণ কাহিনি শোনান। সাতের দশকের কবিতা নিয়ে বলেন সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, সত্যবতী গিরি, দেবকুমার বসু প্রমুখ।

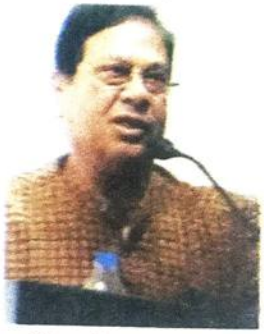

# জমজমাট কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব



একজন খুন হয়েছে। খুন করেছে সরকার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি। সেই খুন দেখেছে সরকার ঘনিষ্ঠের স্ত্রী। এবার কী হবে? বিচার পাওয়া যাবে? স্ত্রী তারলান কী করবে? রাজনৈতিক চাপ, নিজের ভাবমূর্তি, নিজের জীবনযাপন তুচ্ছ করে, মৃত ব্যক্তির বিচার চাইতে যাবে? এই এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবে ইরানের 'দ্য উইটনেস'। নাদের্ভ সেইভারের পরিচালনায় এই ছবিটির গল্প লিখেছেন ইরানের বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জাফর পানাহি। সম্পাদনার কাজও পানাহি নিজেই করেছেন। ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি দেখানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের সাড়া জাগানো এই ছবিটি আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে স্থান পেয়েছে। ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শহর তথা বাংলার সিনেপ্রেমীদের জন্য এই চলচ্চিত্র উৎসব আসলে সারা বিশ্বে মুক্তিপ্রাপ্ত চমৎকার সব ছবি দেখার একটা মঞ্চ। ৩০তম চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হল তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' দিয়ে। আন্তর্জাতিক বিভাগে এই বছর মোট ১৪টি ছবি মনোনীত হয়েছে। ইরান, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, জাপান সহ বিভিন্ন দেশের ছবি রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে একটি বাংলা ছবিও। আশিস অভিকুন্তক পরিচালিত ছবিটির নাম 'বিধ্বস্ত'। এক এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট পুলিস আধিকারিকের ধর্মীয় দ্বন্দ্বের গল্প বলবে এই ছবি। এছাড়াও ভারতীয় ভাষা বিভাগে মনোনীত ছবির তালিকা রয়েছে মোট ১১টি ছবি। এই তালিকায় বেশ কয়েকটি বাংলা ছবি রয়েছে। অমর্ত্য ভট্টাচার্যের 'লহরী', সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরীর 'ন'মাস ন'দিন এবং অন্তহীন...'। এই চলচ্চিত্র উৎসবের আরও একটি জনপ্রিয় বিভাগ হল এশিয়ান সিলেক্ট (নেটপ্যাক)। এতে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের ছবি দেখানো হয়। প্রতিযোগিতামূলক এই বিভাগে মোট ন'টি ছবি রয়েছে। ভারত ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন সহ একাধিক দেশের ছবি রয়েছে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল ছোট ছবি। প্রতিযোগিতামূলক এই বিভাগে মোট ২০টি ছোট ছবি মনোনীত হয়েছে। 'খিড়কি' নামের একটি ছোট ছবি এই বছর উৎসবের মূল আকর্ষণ। যেখানে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। দেখানো হয়েছে, এক বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে বাইরের জগতের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হল জানলা। একদিন আচমকাই সেই জানলা থেকে সরিয়ে ওই বৃদ্ধকে জানলাবিহীন একটি বাড়িতে নিয়ে এসে রাখা হয়। তার ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। এই অবস্থায় জীবনের এক নতুন মানে খোঁজার চেষ্টা করে ওই বৃদ্ধ। আনহাদ মিশ্র পরিচালিত এই ছোট ছবিতে সেই বৃদ্ধের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন। আর একটি ছোট ছবি 'আ নাইট, আফটার অল'-এ অভিনয় করেছেন রত্না পাঠক শাহ, রঞ্জিত কাপুরের মতো অভিনেতারা। ষাট বছরের দোরগোড়ায় পা দেওয়া এক দম্পতি বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে। নিবিড় কথোপকথনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রূপরেখা ঠিক করে নিচ্ছে। এই ছোট ছবিটি পরিচালনা করেছেন অংশুল আগরওয়াল। তথ্যচিত্র বিভাগে এ বছর দশটি ছবি মনোনীত হয়েছে। বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে সাতটি ছবি রয়েছে। রয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'এই রাত তোমার আমার'। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন অঞ্জন দত্ত ও অপর্ণা সেন। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে বৈবাহিক জীবনের ৩০টা বছর কাটিয়েছে এক দম্পতি। এক রাতে তারা বুঝতে পারে, আসলে সেই ৩০ বছর আগের মতোই এখনও তাদের মনে একইভাবে আবেগ, ভালোবাসা সবটাই অটুট রয়েছে। এমনই একখানা গল্প বলবে পরমব্রতর এই ছবিটি।

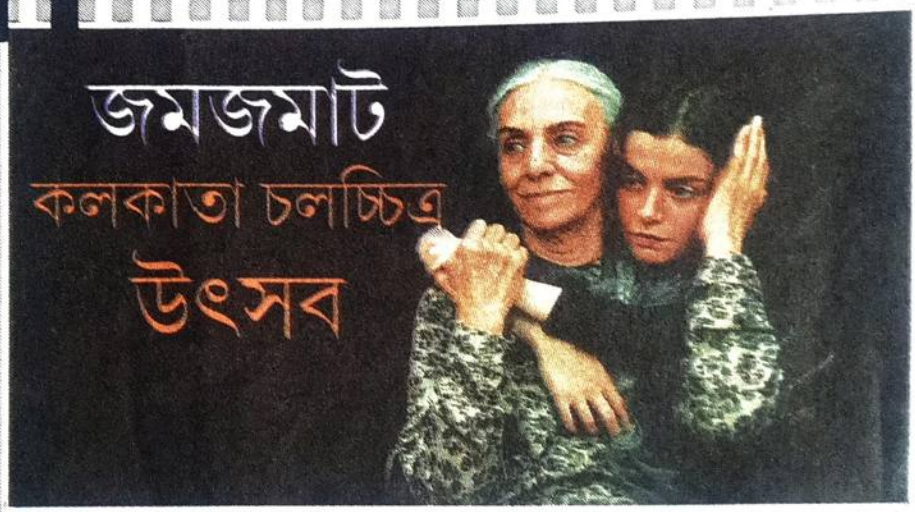

অন্যদিকে, এ বছর সিনেপ্রেমীদের জন্য একটি দুঃখের খবর রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এই প্রথমবার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নেই বাংলাদেশের কোনও ছবি। অনেকেই এই উৎসবের দিকে তাকিয়ে থাকে, বাংলাদেশের ছবি দেখার জন্য। কিন্তু এই বছর সেই ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে না। কেন? চলচ্চিত্র উৎসবের এক আধিকারিকের কথায়, 'ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়াটাই মূল কারণ।' বিশ্বের দরবারে এখন কেমন ছবি হচ্ছে, তা বড়পর্দায় পরখ করে নেওয়ার জন্য ফের নন্দন চত্বরে দর্শকদের লম্বা লাইন চোখে পড়ছে।

**সোহম কর**

# জীবন এক বৃত্ত

অবিনাশ তিওয়ারি ও জিমি শেরগিল

বড়পর্দার পাশাপাশি ওটিটি তে সমান তালে কাজ করে চলেছেন অভিনেতা অবিনাশ তিওয়ারি। তবে ওটিটির দৌলতে আজ তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। 'খাকি: দা বিহার চ্যাপ্টার', 'বোম্বাই মেরি জান', 'বুলবুল' এর মতো প্রজেক্টে অবিনাশের অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। এবার তাঁকে নেটফ্লিক্সের রহস্য রোমাঞ্চ ঘরানার ছবি 'সিকান্দর কা মুকাদ্দর' এ মূল চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। নীরজ পাণ্ডে পরিচালিত এ ছবিতে তিনি সিকান্দর শর্মার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। এছাড়াও রয়েছেন জিমি শেরগিল। এর আগে নীরজ পাণ্ডের 'খাকি: দা বিহার চ্যাপ্টার' সিরিজে অভিনয় করেছেন অবিনাশ। তবে সেই সিরিজটি পরিচালনা করেছিলেন ভাব ধুলিয়া। তাই নীরজের পরিচালনায় এই প্রথম কাজ করলেন অবিনাশ। এই প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'নীরজ স্যারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। ওঁর গল্প বলার ধরন সবসময় আলাদা হয়। ওঁর গল্প অত্যন্ত বাস্তবের কাছাকাছি। ছবিতে থ্রিলারের সঙ্গে ড্রামা আছে। নীরজ স্যারের থ্রিলার অন্যদের থেকে আলাদা। আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ওঁর মতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে আমি কোনও পরিচালককে দেখিনি। মুহূর্তের মধ্যে যেকোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। আর ওঁর ওয়ান টেক শট সত্যি দুর্দান্ত। এর পিছনে রয়েছে অনেক পরিশ্রম।'

বড়পর্দায় অবিনাশকে শেষ দেখা গিয়েছে 'মাদগাঁও এক্সপ্রেস'-এ। বড়পর্দা না ওটিটি, আপনার প্রিয় জায়গা কোনটা?

হালকা হেসে অবিনাশ বলেন, 'অবশ্যই বড়পর্দা। বড়পর্দায় কাজ করার অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম। সবাই মিলে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার যে মজা, তার বিকল্প হয় না। কিন্তু সব গল্প তো বড়পর্দায় দেখানো সম্ভব নয়। সেইসব ছবি ওটিটি তে একান্তে উপভোগ করা যায়।'

একটা প্রজেক্ট নির্বাচনের সময় কী দেখেন? অভিনেতার জবাব, 'আমি নিজেকে প্রথম দর্শকের আসনে বসাই। দর্শক হিসেবে যদি চরিত্রটা পছন্দ হয়, তাহলেই হ্যাঁ বলি।'

বিশ্বায়নের যুগে ওটিটির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবিনাশের বক্তব্য, 'ওটিটিতে দর্শক নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিরিজ বা ছবি দেখতে পাচ্ছেন। বাচ্চারা তাদের মতো কনটেন্ট দেখতে পাচ্ছে। আগে যেটা কখনওই সম্ভব ছিল না। একটা ছবি বিশ্বের যেকোনও প্রান্ত থেকে বসে দেখা যাবে, এটা তো আগে ভাবাই যেত না। ওটিটি-র কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর কাজের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে।'

'সিকান্দর কা মুকাদ্দর' ছবিতে পুলিস অফিসারের চরিত্রে রয়েছেন জিমি শেরগিল। ছাত্রজীবনে জিমিকে দেখে অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা বলছিলেন অবিনাশ, 'যখন অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম, তখন জিমি স্যার আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন। আর এখন ওঁর পাশে বসে আছি, ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি— মনে হচ্ছে জীবন এক বৃত্ত।'

দেবারতি ভট্টাচার্য

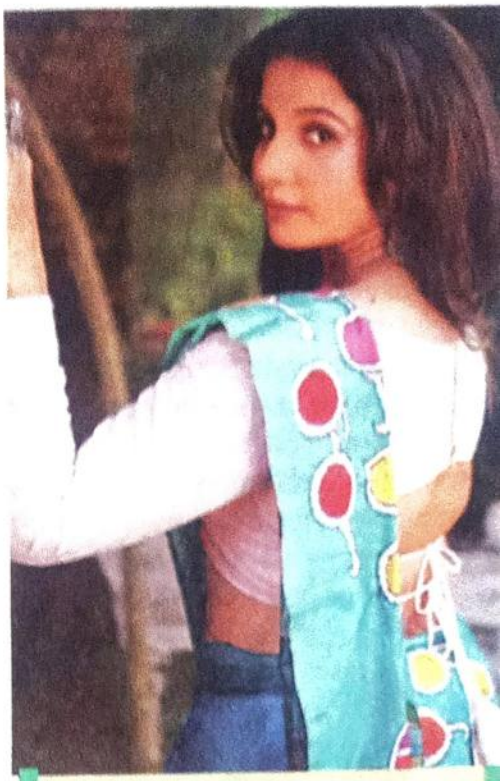

# ফের অঙ্গনা

শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্টার জলসার 'তুমি আশেপাশে থাকলে' সিরিজ থেকে সরে যেতে হয় অঙ্গনা রায়কে। আপাতত তিনি সুস্থ। তাই স্বল্প বিরতি নিয়ে আবার কাজে ফিরছেন অভিনেত্রী। এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। প্রথম থেকেই খুব বেছে বেছে কাজ করে আসছেন অঙ্গনা। এবার তাঁকে দেখা যাবে 'হইচই'-এর একটি ওয়েব সিরিজে। নাম 'চিরদিনই তুমি যে আমার'। এটাই প্রথম নয়, অভিনেত্রীকে এর আগে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের একাধিক কাজে দেখা গিয়েছে। তাই বিরতির পর আবার চেনা জায়গায় ফিরছেন তিনি। অঙ্গনা ছাড়া সিরিজের বিশেষ চরিত্রগুলোতে কাজ করছেন মানালি দে, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়। পরিচালক অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী। এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রথম কাজ অরিজিতের। এর আগে আড্ডা টাইমস-এর জন্য কয়েকটি কাজ করেছেন। তারমধ্যে অন্যতম 'দেখেছি তোমাকে শ্রাবণে'। ডিসেম্বরে 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর কাজ শুরুর কথা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

# বলরাম কাণ্ড

# গার্গী-রজতাভ কমেডি ছবিতে

নতুন বছরে ভিন্ন স্বাদের হরেক ছবি নিয়ে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি। পরিচালক সপ্তাশ্ব বসু দর্শকদের উপহার দিতে চলেছেন একটি নির্ভেজাল কমেডি ছবি। ছবির নাম 'বলরাম কাণ্ড'। পরিচালকের কথায়, 'নতুন বছরটা হাসি ও মজা দিয়ে শুরু করতে চাই। প্রায় রোজই কোনও না কোনও খারাপ খবর শুনি। সমাজ সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। তবে সব তো খারাপ নয়। ভালো কিছুও তো আছে। তাই আমরা চাই, নতুন বছরটা সকলের খুব পজিটিভ হোক। এই ছবি সবাইকে রিফ্রেশ করে দেবে।' ছবির মূল চরিত্রে গার্গী রায়চৌধুরী ও রজতাভ দত্ত। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'মুখোমুখি'-র পর আবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাবে।

'রামধনু', 'হামি' ও 'হামি ২'-এর পর ফের কমেডি জ্যঁরে ফিরে গার্গী খুবই উচ্ছ্বসিত, 'আমি সাধারণত মজার ছবি করতে চাই। খুব ভালো লাগে কমেডিতে কাজ করতে। কিন্তু আমার কাছে আসে যত রাজ্যের গম্ভীর সিরিয়াস ছবির অফার! গভীর জটিল কাজ সব আমার জন্য ভেবে রাখা হয়! আমি যে আদ্যন্ত একটা সরল মেয়ে আর ভীষণ সরল ছবি করতে চাই সেটা কেউ বোঝেই না!' একটু আদুরে কণ্ঠস্বর অভিনেত্রীর। তাঁর আরও সংযোজন, 'মানুষের যাকে নিয়ে যে পারসেপশন থাকে, তার বাইরে গিয়ে চমকে দিতে বেশ লাগে! রামধনু, হামি ও হামি ২— যেমন খুব খুশির ছবি, এই ছবিটা করতে গিয়েও ঠিক সেরকম আনন্দ পেয়েছি।'

কমেডি ছবি আর রজতাভ দত্ত যেন সমার্থক শব্দ! এই ছবির কমেডিতে আলাদা ট্যুইস্ট কী আছে?

'আলাদা কি না জানি না! কারণ আমার মনে হয় না, একটা কাজ পপুলার বা হিট হওয়ার জন্য আলাদা হওয়ার প্রয়োজন আছে। ববি, বেতাব, এক দুজে কে লিয়ে— এ রকম অজস্র লাভস্টোরি কোনওটা কোনওটার থেকে আলাদা নয়। অথচ, প্রত্যেকটাই হিট। গল্প নিশ্চয়ই ভিন্ন। কিন্তু আমার কথা হল গোটা পৃথিবীতে এত হাজার হাজার ছবি তৈরি হচ্ছে, অথচ জ্যঁর তো মাত্র সাত-আটটা। কাজেই গল্প তাদের আলাদা করে,' বলছিলেন রজতাভ। তাঁর বক্তব্য, 'কমেডি খুব শক্ত একটা ধারা। মানুষ সবসময়ই একটা ভালো কমেডি দেখতে পছন্দ করে। কারণ চারপাশের এত দুঃখকষ্ট ও দুশ্চিন্তার মধ্যে মানুষের নির্ভেজাল কমেডি ছবি দেখার প্রতি একটা আলাদা আগ্রহ থাকে।'

তিনি মনে করেন, কমেডি ছবি দেখে মানুষ আনন্দ পেতে চায়। সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্ব আঙ্গিক কমেডি। যাতে এই ঘরানার ছবি দেখে সব বয়সের দর্শক আনন্দ পেতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

'বলরাম কাণ্ড' ছবিটিতে গার্গী একজন ম্যারেজ কনসালটেন্ট। নাম তরঙ্গিণী। তরঙ্গিণীর নিজের বিবাহিত জীবন বারো বছর আগেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। তাদের একটি মেয়ে আছে যে খুব কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের কথা ভাবে। তরঙ্গিণী মেয়েকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বারো বছর পর স্বামী কিশোরের সাহায্য চায়। মেয়েকে বাঁচানোর গল্প বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। গার্গীর কথায়, 'সুন্দর ঝকঝকে একটা গল্প। যাতে মজা আছে, আনন্দ আছে, আবেগ আছে! যেগুলো দারুণ মজার মোড়কে প্রেজেন্ট করা হয়েছে। স্ক্রিপ্টটা দারুণ! ওটা পড়েই এই ছবির বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলাম।'

ইন্ডাস্ট্রির তাবড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার পর একজন নতুন পরিচালকের ছবিতে কাজ করাটা কি একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল না? জবাবে গার্গী বললেন, 'আমি এখন নতুনদের সঙ্গেও কাজ করতে চাই। আগে মনে হতো চেনা বৃত্তের বাইরে গিয়ে লাভ কী! এখন মনে হয় চেনা বৃত্তের বাইরে পা রাখাটাই চ্যালেঞ্জ।' পছন্দ মাফিক ওয়েব সিরিজের কাজ পাচ্ছেন না বলে এখনও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে পা রাখেননি। টেলিভিশন ও বড়পর্দার মতোই ওটিটির ক্ষেত্রেও খুব মেপে পা ফেলতে চাইছেন, তা জানাতেও ভুললেন না তিনি।

গোটা ছবির শ্যুটিং হয়েছে নৈনিতালে। রজতাভ বললেন, 'নিছকই শ্যুটিং লোকেশন হিসেবে নয়, একটা ক্যারেক্টার হিসেবে নৈনিতাল জায়গাটা গল্পে উঠে এসেছে। যে বাড়িতে ছবির অধিকাংশ শ্যুটিং হয়েছে সেটা প্রায় দুশো বছরের পুরনো একটি ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। কাকতালীয় ঘটনা যে, ওই বাড়িটির নামও বলরামপুর হাউস। সবটাই গল্পের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছে।' ছবিতে রজতাভ-গার্গীর কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঐশ্বর্য সেন। তাছাড়াও আছেন আর্য দাশগুপ্ত, অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন সাহা প্রমুখ।

**সঙ্গীতা চৌধুরী**

# মিত্তির বাড়ি

## ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী পরিবার

আদৃত ও পারিজাত

এক বাটি ঝাল মুড়ি মাখা। তাতে গিজগিজ করছে কাঁচা লঙ্কার টুকরো। দেখে আঁতকে উঠলেন অনুরাধা রায়। বড় বড় চোখ করে হাঁক পড়লেন দুলাল লাহিড়ী, 'ওরে এটা কে মেখেছিস? এক মুঠো খেয়ে যা।' ছুটে এলেন ইউনিটের এক কর্মী। 'এক্ষুনি লঙ্কাগুলো বেছে ফেলে দিচ্ছি দাদা,' বলে দুলাল লাহিড়ীর হাত থেকে ছোঁ মেরে বাটি নিয়ে অদৃশ্য হলেন। পরক্ষণেই এক ঠোঙা তেলে ভাজা নিয়ে হাজির পারিজাত চৌধুরী। অনুরাধা রায় হাত বাড়িয়ে এক টুকরো বেগুনি মুখে পুরে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'বাঃ বেশ তো।' বলে গোটা বেগুনিটাই ঠোঙা থেকে তুলে খেতে শুরু করলেন তিনি। দেখাদেখি দুলাল লাহিড়ীও। মুহূর্তে ঠোঙা ফাঁকা। ইতিমধ্যে আদৃত রায়ের প্রবেশ এবং ধমক। 'এই বয়সে তোমাদের হচ্ছে কী! ভরদুপুরে গপগপ করে বেগুনি খাচ্ছ!' পারিজাতের প্রতিক্রিয়া, 'আসলে উনি এখন একাহারি তো। একবেলা খান। তাও বাড়ি থেকে আনা খাবার। ওই জন্য গলার জোর বেশি।' শুনে দুলাল লাহিড়ী বললেন, 'বোঝা' কথার ফাঁকে সহকারী পরিচালক এগিয়ে এসে বললেন, 'শট রেডি।' টুলের উপর রাখা হল লঙ্কা ছাড়া মুড়ির বাটি। আসলে শট নয়, তোলা হবে রিলস। জি বাংলায় সদ্য শুরু হওয়া ধারাবাহিক 'মিত্তির বাড়ি'র অন্দরমহলের টুকরো মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে মহলের মাথা সুধাচরণ মিত্তির। স্ত্রী চন্দ্রাবতী দেবী। নিজস্ব আভিজাত্য নিয়ে বেঁচে থাকতে চান সুধাচরণ। বসতবাড়িটাই তাঁর সবকিছু। বাড়ি নিয়ে কোনও বেয়াদপি বরদাস্ত করতে নারাজ সুধাচরণ। তাঁর তিন ছেলে। এক মেয়ে। ছেলেরা থেকেও নেই। পৈতৃক ভিটের আভিজাত্যের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারছে না। ফলে কেউই আর জন্মভিটেতে থাকে না। বরং তিন ভাই-ই প্রোমোটিংয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ে অবশ্য বাবা-মায়ের দুঃখ, একাকিত্বটা বোঝে। বৃদ্ধ সুধাচরণ বুক দিয়ে আগলে রাখতে চান বাড়িটাকে। পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ অভিনেতা দুলাল লাহিড়ীই মিত্তির বাড়ির সুধাচরণ। ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী ঐতিহ্যের চটা ওঠা উঠোনে বসে দুলালের উপলব্ধি, 'বয়স হলে এই বুড়ো-বুড়িদের দায়িত্ব আর কেউ নিতে চায় না। এটাই বাস্তব। বাড়ির মতোই মানুষগুলোর ভ্যালুজটা দেখানোর জন্যই এই মিত্তির বাড়ি।' চন্দ্রাবতীর চরিত্রে অনুরাধা। তাঁর অনুযোগ, 'আমরা এখন অতিরিক্ত।' এহেন রিক্ততার মধ্যেও কখনও কখনও পরের প্রজন্ম প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে যায় খসে পড়া পলেস্তারায়। সুধাচরণের নাতি ধ্রুব তেমনই এক প্রাণবায়ু। যদিও দাদুর সঙ্গে তার মতের অমিলটাই বেশি। তবুও পেশায় উকিল ধ্রুব মনে করে, 'শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবেই। শিরদাঁড়া সোজা রেখে সত্যের জন্য লড়তে হবে।' মিঠাইয়ের উচ্ছেবাবু আদৃত রায় দেড় বাঙালির বসার ফিরলেন ধ্রুবর সাজে।

বছর বাদে ঘরে

উচ্ছেবাবুকে দর্শক মন থেকে উচ্ছেদ করে ধ্রুবকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই চ্যালেঞ্জ। সেই কারণেই কঠিন ডায়েট। এখন একবেলা আহার করছেন আদৃত। ওয়ার্কশপ করেছেন গত দেড় মাস ধরে। 'তারপরেও ধ্রুবকে মানুষের মনে ধরবে কি না সেটা সময়ই বলবে,' সাবধানী আদৃত। অন্যদিকে, আদুরে আশ্রিতা জোনাকির জেদ, নিজের জীবন যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক না কেন, আলোর পতঙ্গের মতো এক এক করে মিত্তির বাড়ির নিভে যাওয়া আলোগুলো জ্বালাতেই হবে তাকে। সেই ছোট্টবেলা থেকেই লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের অঙ্কে ঘোরাফেরা করা পারিজাতকে দর্শক সম্প্রতি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন ওয়েব সিরিজ 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এ নামভূমিকায়। এবার তিনি জোনাকির ছটফটানি নিয়ে হাজির। পারিজাত বললেন, 'চরিত্রটা অনেকটা আমার মতো। জোনাকি চায় নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্বটা তুলে নিতে।' সিরিয়ালের সাফল্য-ব্যর্থতার দায় বেশিরভাগ সময়ে এখন মহিলা প্রোটাগনিস্টের ঘাড়েই বর্তায়। তার উপর এই ধারাবাহিকটির প্রযোজক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'বুম্বা আঙ্কেলে'র পছন্দের অভিনেত্রী পারিজাত আত্মবিশ্বাসী 'মিত্তির বাড়ি দর্শকদের ভালো লাগবেই।' ভালো লাগার ক্ষেত্রে কোনও কম্প্রোমাইজে রাজি নন স্বয়ং প্রযোজকও। সাম্প্রতিক সময়ের ছোটপর্দার তারকারাই অভিনয় করছেন ধারাবাহিকটিতে। ফলে সেদিন ফ্লোরে পা রেখে মনে হল, মিত্তির বাড়ি যেন প্রযোজক প্রসেনজিতের একান্নবর্তী সংসার।

**প্রিয়ব্রত দত্ত**

## ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

**সপ্তাহের প্রারম্ভে রাশিচক্রে গ্রহাবস্থান: বৃশ্চিকে রবি, বক্রী বুধ, কুম্ভে চন্দ্র শনি, মকরে শুক্র, কর্কটে বক্রী মঙ্গল, বৃষে বক্রী বৃহস্পতি, মীনে রাহু, কন্যায় কেতু।**

**মেষ রাশি:** উপার্জন বাড়লেও ব্যয়ের চাপ বাড়ায় সঞ্চয়ে ঘাটতি। দাম্পত্য/পারিবারিক দিকটি মোটামুটি। কলা ও বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে অগ্রগতি। অংশীদারি ব্যবসায় মন্দা। আকস্মিক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। মানসিক চাঞ্চল্য বাড়বে। ধর্মকর্মে মন আকৃষ্ট হবে।
**শুভদিন: ১০, ১১, ১২**

**বৃষ রাশি:** সপ্তাহটি অর্থ কর্মে শুভ। সুসিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় কাজকর্মে সাফল্য। শৌখিন দ্রব্য, রত্ন ও অলঙ্কারের ব্যবসায় বুধবার পর্যন্ত চাপ থাকবে। উচ্চ বা উচ্চতর শিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণায় শুভ। অর্থাগমের উত্তম যোগ। পারিবারিক সুখ ক্রমশ বাড়বে।
**শুভদিন: ৭, ৮, ১৩**

**মিথুন রাশি:** ছোটখাট শারীরিক ভোগান্তি ও দেহে আঘাত প্রাপ্তির যোগ আছে। উল্লেখযোগ্য কর্ম সাফল্য ও সুনাম বজায় থাকবে। চুক্তি ভিত্তিক কর্মের মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আইন ও কলা বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় শুভ সময়। গৃহক্ষেত্রে চাপ কিছুটা থাকবে।
**শুভদিন: ৮, ৯, ১০**

**কর্কট রাশি:** অর্থকড়ি উপার্জন কমবেশি ভালোই হবে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় জটিল কর্ম সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। দাম্পত্য ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা যাবে না। শরীর স্বাস্থ্যের দিকটি খেয়াল রাখুন। সাবধানে চলাফেরা করুন। মনের হতাশভাবকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ভালোই হবে।
**শুভদিন: ১০, ১২, ১৩**

**সিংহ রাশি:** সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পিতামাতা ও ভাই বোনের সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্যের যোগ বিদ্যমান। কাজকর্ম একপ্রকার চলবে। মোহের বশে করা কাজের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। পুরনো রোগের সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ভ্রমণ যোগ আছে।
**শুভদিন: ১০, ১১, ১২**



**তুলা রাশি:** কাজকর্মে বিলম্বিত অগ্রগতি। গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কর্ম সম্পাদনে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। শিল্পী, সাহিত্যিকদের পক্ষে সপ্তাহটি ভালোই কাটবে। বিদ্যার্থীদের অধ্যয়নে মনোযোগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। দাম্পত্য ক্ষেত্রটিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাগমের ক্ষেত্রটি চলনসই। ধর্মকর্মে মন থাকবে।
**শুভদিন: ৮, ৯, ১০**

**কন্যা রাশি:** গুরুত্বপূর্ণ কর্মে সাফল্য ও সুনাম বজায় থাকবে। অবৈধ প্রণয়ে বিড়ম্বনা বাড়ার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়িক কর্মে বাধা মুক্তি ও অগ্রগতির যোগ আছে। দাম্পত্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক তালমিলের অভাব হবে। গবেষকদের সাফল্য ও সুনামের যোগ আছে। ভ্রমণে সতর্ক হন। মনে অস্থির ভাব থাকবে।
**শুভদিন: ৭, ৮, ১৩**

**বৃশ্চিক রাশি:** সপ্তাহটি বেশ ভালোই কাটবে। রাজনীতিকদের কর্ম সাফল্য, জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সৃজনশীল কর্মে উন্নতি ও খ্যাতিলাভের যোগ আছে। বিবাহের যোগাযোগ আসতে পারে। শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না। অর্থকড়ি দিকটি ঠিক থাকবে। ধর্মাচরণে মন যাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে।
**শুভদিন: ১০, ১২, ১৩**

**ধনু রাশি:** প্রশাসক বা প্রশাসনিক কর্মী, বিমা, আইটি কর্মী, আইনজীবীদের পক্ষে শুভ সপ্তাহ। পড়ুয়াদের অধ্যয়নে বাধা কাটবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শুভ ফলের আশা। পতি-পত্নীর পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে।
**শুভদিন: ১০, ১১, ১২**

**মকর রাশি:** বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বে কর্ম জটিলতা কাটিয়ে অগ্রগতি। সৃজনশীল কর্মে শুভ। আয়ের ক্ষেত্রটি ঠিক থাকবে। পড়ুয়াদের পক্ষে সপ্তাহটি অনুকূল, পরীক্ষায় শুভফল লাভ। বাক্যের রুক্ষতা ও মানসিক অস্থিরতায় লাগাম দিন। স্বাস্থ্যে সমস্যা।
**শুভদিন: ৭, ৮, ১৩**

**কুম্ভ রাশি:** সপ্তাহটি কাজকর্ম ও বিদ্যার দিকে কমবেশি শুভ। অর্থাগমের নতুন দিশা পেতে পারেন। গৃহ সংস্কারে বাধা আসতে পারে। ধনভাগ্য অপেক্ষাকৃত শুভ। যানবাহন ক্রয়ের যোগ আছে। স্বাস্থ্য একপ্রকার থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে বড় কোনও পরিবর্তন নেই।
**শুভদিন: ৮, ৯, ১০**

**মীন রাশি:** চল্লিশোর্ধ্ব বয়সি যাঁদের হার্ট বা পুরনো রোগ আছে, তাঁরা বিশেষ সাবধানে থাকুন। কাজকর্মে অগ্রগতি ভালোই হবে। পারিবারিক দিকটিতে শান্তির অভাব বজায় থাকবে। বিদ্যায় বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে মন যাবে এবং মানসিক শান্তিলাভ হবে।
**শুভদিন: ১০, ১২, ১৩**

Like us on facebook.com/www.cookme.in
Cookme
Spicemakers since
ফটাফট!
শুধু মেশান,
মাখুন আর রাঁধুন
Cookme
Ready to Cook
for
Chicken Curry
Mixture of spices
Cookme
Ready to Cook
for
Pulao
Mixture of spices
Enhanced Taste & Flavour
Trade enquiry-র জন্য marketing@cookme.in-এ email করুন